জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের



১৭তম

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ZIAUR RAHMAN FOUNDATION

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের



১৭তম

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ZIAUR RAHMAN FOUNDATION

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

সম্পাদনা

আমিরুল ইসলাম কাগজী

প্রকাশকাল

১৮ অক্টোবর ২০২৬

প্রচ্ছদ

অধ্যাপক ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম

প্রকাশক

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

বাড়ি # ২, রোড # ২৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

অলংকরণ ও মুদ্রণ

ইন্টারগ্রাফিক লিমিটেড

হোসেন টাওয়ার, ১০ম তলা, সুইট-১০০২, ১১৬ নয়া পল্টন

ঢাকা-১০০০, মোবাইল: ০১৭১৩৩৩০৫৩০



সম্পাদকীয়



'The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others.' 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য হলো সেবা করা, সহমর্মিতা প্রদর্শন করা এবং অন্যকে সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করা।' এই অমর উক্তির স্রষ্টা আলবার্ট শোয়াইটজার (Albert Schweitzer), যিনি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী একজন মানবাধিকার কর্মী। তাঁর মতে মানুষের জীবন কেবল নিজের জন্য নয়; অন্যের জন্য বেঁচে থাকার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনেই একটি অভিন্ন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে–মানুষের দুঃখে পাশে দাঁড়ানো, অসহায়ের মুখে হাসি ফোটানো এবং বিপন্ন মানুষের জীবনে আশার আলো জ্বালানো। মানব সেবার এই চিরন্তন দর্শনকে ধারণ করে ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠানটি অতিক্রম করেছে ২৭টি বছর। ১৮ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মরণিকা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ পথচলার স্মারক নয়–এটি মানবতার প্রতি অঙ্গীকার, ত্যাগ, ভালোবাসা আর দায়বদ্ধতার এক জীবন্ত দলিল।

মানব সেবা কোনো নির্দিষ্ট পেশা, রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি মানুষের প্রতি মানুষের চিরন্তন দায়িত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর অন্যতম মানবসেবী মাদার তেরেসা বলেছিলেন, 'একশো মানুষকে খাওয়াতে না পারলে অন্তত একজনকে খাওয়াও।' এই ছোট্ট কথার মধ্যেই মানব সেবার বিশাল দর্শন লুকিয়ে আছে। মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য বিশাল সামর্থ্যের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন একটি সংবেদনশীল হৃদয়, আন্তরিক সদিচ্ছা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সাহস। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের দীর্ঘ পথ চলায় এই দর্শনের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

আজকে যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান তিনি ১৯৯৯ সালে খুলনার দিঘলিয়ায় একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু করেন। সেই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া। একটি ছোট্ট উদ্যোগ কীভাবে সময়ের পরিক্রমায় বৃহত্তর মানবকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে পারে, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি কৃষকের স্বার্থে সুলভ মূল্যে বীজ উৎপাদন, কৃষি কাজে পানি সরবরাহ, গবাদিপশুর টিকাদানসহ বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

মানব সেবার প্রকৃত পরীক্ষা হয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে। যখন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস কিংবা করোনা মহামারি মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বিপন্ন করে তোলে, তখন মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সঙ্কটকালে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির মতো ভয়াবহ সময়ে যখন মানুষ ঘরবন্দি, চিকিৎসাসেবা সীমিত এবং জীবন অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন, তখন ঝুঁকি উপেক্ষা করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে মানবিক দায়িত্ববোধ প্রয়োজন, ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

পৃথিবীর আরেক মহান মানবসেবী আবদুল সাত্তার এধি বলেছিলেন, 'মানুষ শিক্ষিত হয়েছে কিন্তু এখনো প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি।' তাঁর এই বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিক্ষার প্রকৃত মূল্য কেবল সনদ অর্জনে নয়; বরং মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীল আচরণে। এধির জীবন ছিল মানব সেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি কিংবা পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি মানুষের সেবা করেছেন। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মানবিক দর্শনের ক্ষেত্রেও এই সর্বজনীনতার গুরুত্ব অপরিসীম।

জেডআরএফ-এর পথচলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–রাজনীতির বাইরে থেকেও জনগণের সেবায় ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টা। রাজনীতি রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমাজ পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও মানব সেবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য নয়। একজন চিকিৎসক, শিক্ষক, কৃষিবিদ কিংবা সমাজকর্মী নিজ নিজ অবস্থান থেকেই মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে পারেন। একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭ বছরের যাত্রা সেই সম্ভাবনাকেই সামনে নিয়ে এসেছে।

ফাউন্ডেশনের বর্তমান নেতৃত্বও মানব সেবার এই ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জুবাইদা রহমান এবং নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারসহ ফাউন্ডেশনের বিদগ্ধ সদস্যগণের উদ্যোগ ও সম্পৃক্ততা এর কর্মপরিধি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবায় চিকিৎসকদের সম্পৃক্ততা, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কিংবা দুর্যোগকালে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম মানবিক দায়বদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

আমাদের সমাজে দরিদ্র মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্কটগুলোর অন্যতম হলো চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ। অর্থের অভাবে একজন অসুস্থ মানুষ যখন চিকিৎসা নিতে পারেন না, তখন তার অসহায়ত্ব কেবল ব্যক্তিগত দুর্ভোগে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা একটি সামাজিক বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। একইভাবে একজন মেধাবী শিক্ষার্থী যখন আর্থিক সঙ্কটের কারণে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে পারে না, তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি পরিবার এবং সম্ভাবনাময় একটি ভবিষ্যৎও। তাই চিকিৎসা, শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ মানব সেবার অপরিহার্য অংশ।

মানবতার সেবা কোনো সাময়িক কর্মসূচি নয়; এটি একটি অবিরাম যাত্রা। সেই যাত্রায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আগামী দিনগুলোতেও মানুষের পাশে থাকবে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এর পরিচালক, উপদেষ্টা, কো-অর্ডিনেটর, মনিটর এবং স্বেচ্ছাসেবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মানবতার কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠান তার অঙ্গীকার ও কর্মযজ্ঞ নিয়ে চিরস্থায়ী হোক–এই আমাদের প্রত্যাশা।

আমিরুল ইসলাম কাগজী

১৮ অক্টোবর, ২০২৬

সূচিপত্র

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদ ১০

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা পরিষদ ১২

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটি ১৩

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপ-কমিটি ১৪

অর্থ উপ-কমিটি
অভ্যর্থনা উপ-কমিটি
প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি
ভেন্যু নির্বাচন ও মঞ্চ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি
শৃঙ্খলা উপ-কমিটি

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-এর নেপথ্য কথা ■ অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার ১৫

মানুষের কল্যাণে রাজনীতি, শহীদ জিয়াউর রহমানের দর্শন ও জেডআরএফ-এর মানবিক অভিযাত্রা ■ অধ্যাপক ড. মোহা. হাছানাত আলী ১৯

রাজনীতির উর্ধ্বে মানবতা, মানুষের পাশে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ■ অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান ২২

পরিবেশ রক্ষায় জেডআরএফ-এর বৃক্ষরোপণ ■ অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান ২৫

আগামীর বাংলাদেশ : মেধার শক্তিতে নতুন উদ্ভাবন ■ ডা. সৈয়দা তাজনিন ওয়ারিস এবং অধ্যাপক ড. এস এম সোহাগ আওয়াল ২৭

জনকল্যাণ ও সফট পাওয়ার প্রেক্ষাপটে জেডআরএফ-এর নতুন পথরেখা ■ অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম ২৯

সেবার ব্রতে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ■ অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল ৩২

শিশু ও নারী শিক্ষায় বেগম খালেদা জিয়া–জেডআরএফ-এর অনুপ্রেরণার উৎস ■ আমিরুল ইসলাম কাগজী ৩৪

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন যে কাজটি করতে পারে ■ ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন আহমেদ অসীম ৩৮

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গ্রামীণ উন্নয়ন চিন্তা ও স্বনির্ভর সমাজ গঠনের প্রত্যয় ■ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান ৩৯

ভয়ঙ্কর সেই সব রাতের কথা স্মরণ করে এখনও শিউরে উঠি ■ অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ ৪২

কমল বীজ : ভালো বীজ সম্প্রসারণে জেডআরএফ-এর একটি উদ্যোগ ■ কৃষিবিদ ড. খন্দকার মাহফুজুল হক ৪৫

একটি উদ্যোগ, একটু চেষ্টা, এনে দিবে সচ্ছলতা, দেশে আসবে স্বনির্ভরতা ■ অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন ৪৬

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের লিগ্যাল এইড সেলের এক অনন্য অভিযাত্রা ■ অ্যাডভোকেট আশরাফ জালাল মনন ৫০

মানুষের সেবায় জেডআরএফ-এর সঙ্গে আমার পথচলা ■ ডা. আমিরুল ইসলাম পাভেল ৫২

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমানের মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত ৫৪

পরিশিষ্ট ৫৭

একটি জাতির জন্ম কথা ■ জিয়াউর রহমান ৫৯

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়া : জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সাক্ষাৎকার ■ ডা. জাহিদুর রহিম ৬৪

এ্যালবাম ৬৭



প্রেসিডেন্ট-এর বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী বিশেষ করে চিকিৎসক, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, স্বেচ্ছাসেবক, শুভানুধ্যায়ী এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মানুষের কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯৯ সালে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন–জেডআরএফ-এর পথচলা শুরু হয়েছিল। মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়াই হচ্ছে জেডআরএফ-এর ব্রত। অর্থের অভাবে যারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারেন না, সেই পিছিয়ে পড়া ও হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে জেডআরএফ তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

দীর্ঘ ২৭ বছরের পথচলা সবসময় মসৃণ ছিল না। নানা প্রতিকূলতা, বিশেষ করে দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শাসন শোষণের সময় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মানবসেবার যে অঙ্গীকার নিয়ে জেডআরএফ-এর জন্ম, তা কখনো থেমে যায়নি। প্রতিকূলতার মধ্যেও এই সংগঠনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও চিকিৎসকগণ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

যে কোনো দুর্যোগে ছুটে গেছেন দুর্গত মানুষের কাছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, মহামারি কিংবা অন্য কোনো মানবিক সংকটে মানুষ যখন অসহায়, তখন জেডআরএফ-এর কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা না ভেবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ধরে, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের কঠিন সময়েও সংগঠনের সদস্যরা আন্দোলনকারী ও আহত মানুষের জীবন রক্ষায় সাহসের সঙ্গে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন।

সংগঠনের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই দিনে আমি বিশেষভাবে সেসব চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের স্মরণ করতে চাই, যারা মানব সেবাকে কেবল পেশা হিসেবে নয় বরং মানুষের প্রতি দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রতিকূল সময়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা অসুস্থ, আহত ও বিপন্ন মানুষের চিকিৎসা দিয়েছেন, তাদের অবদান কোনোদিন বিস্মৃত হওয়ার নয়। মানুষের জীবন বাঁচানোর চেয়ে মহৎ কাজ আর কী হতে পারে?

আমি বিশ্বাস করি, একটি সংগঠনের প্রকৃত শক্তি তার ভবন, অর্থ কিংবা সাংগঠনিক কাঠামোতে নয়; তার প্রকৃত শক্তি মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতায়। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো–দুঃসময়ে মানুষের পাশে থাকার এই মানসিকতা, যা আজও অটুট রয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতীতের মতো আগামী দিনেও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন তাদের কর্মপরিধি আরো বিস্তৃত করবে, সেবার পরিসর আরো বাড়াবে। চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা, কৃষি, দুর্যোগ মোকাবিলা, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে হবে।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ এই ২৭ বছরের অভিজ্ঞতা একটি বার্তা দিয়েছে, সেটি হলো, মানুষের প্রতি সেবার মানসিকতাই সেবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। একটি অসহায় মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, একজন দরিদ্র শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়া, একজন কৃষকের পাশে দাঁড়ানো কিংবা দুর্যোগে বিপন্ন একটি পরিবারের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াও মানবতার একেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকতে তাই আমাদের অঙ্গীকার হোক–মানুষের দুঃখে আমরা পাশে থাকব, তাদের বিপদে এগিয়ে যাব এবং সাধ্য ও সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে প্রতিটি অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করব। যারা গত ২৭ বছর ধরে নীরবে, নিঃস্বার্থভাবে এবং সাহসের সঙ্গে মানবসেবার এই অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

আসুন, মানবতার পতাকাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরি। মানুষের সেবাকে আমাদের পরিচয় এবং মানবতাকে আমাদের পথচলার প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করি। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সফল ও সার্থক হোক। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মানুষের কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করুন।

তারেক রহমান
প্রেসিডেন্ট
জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন



ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



১৯৯৯ সালের ১৮ অক্টোবর আর্তমানবতার সেবায় জন্ম নেওয়া জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) আজ তার কলেবর বৃদ্ধি করে বিভিন্ন পেশার মানুষকে একই ছাদের নিচে এনে পরস্পরের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছে। একটি অরাজনৈতিক, বেসরকারি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হাওয়ায় জনগণের প্রয়োজনে সেবা দিয়েছে বিরামহীনভাবে যা জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে করোনাকালীন সময়েও।

জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংগঠনটি মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানবিক মর্যাদা এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়। আজকে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন জাতির কাছে ভরসার এক প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কাজ দেশ-বিদেশে হয়েছে সমাদৃত ও প্রশংসিত।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে জেডআরএফ। একদিকে যেমন ছিল কোভিডকালীন মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে, কড়াইলবাসীর হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের জন্য বিশেষায়িত মেডিকেল ক্যাম্প, ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক লিফলেট ও মশারী বিতরণ, মাইলস্টোন ট্রাজেডিতে আহত শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, প্রাইমারি স্কুল সংস্কার। একই সাথে ছিল পরিবেশ রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির মতো আয়োজন। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় বিজ্ঞান মেলা "ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে ২০২৬" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গরীব ও মেধাবী শিশুদের মাঝে বই বিতরণ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের হেলথ চেক আপ ও ঔষধ প্রদানসহ শিক্ষা উপকরণ প্রদান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সুরভি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত হেলথ চেক আপ ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা, বগুড়াতে মুক ও বধির স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প এর আয়োজন, ভাষানটেক, সাততলা, কড়াইলবাসী যেন নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা পায় সেজন্য ভলান্টিয়ার টিম তৈরি করা, ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনসহ চক্ষু ক্যাম্প এর আয়োজনের মতো উদ্যোগগুলো কেবলমাত্র সামাজিক কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এই কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত মানুষগুলোকে "যেখানেই ভাল কাজ সেখানেই জেডআরএফ" এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছে।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে আজ অবধি অভিজ্ঞতা ও অর্জনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন দেশের মানুষের আস্থার একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে চলেছে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, কৃষি, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ছোট ছোট উদ্যোগ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মানুষের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

মানবিক সেবার এক অনন্য প্লাটফর্ম জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান-এর দেখানো পথেই এগিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি। ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সকল সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দায়বদ্ধতা ও সেবার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের এই পথচলা অব্যাহত থাকুক। প্রতিটি উদ্যোগ মানুষের জীবনে স্বস্তি, সম্ভাবনা ও আত্মনির্ভরতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করুক।

পরিশেষে, ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি সকলের সুস্বাস্থ্য ও শুভকামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জুবাইদা রহমান

ডা. জুবাইদা রহমান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন



আহ্বায়কের কথা



মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার মধ্যেই জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব মহৎ উদ্যোগ মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে, তার মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা। সেই মহান আদর্শকে ধারণ করে ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ)। দেখতে দেখতে মানব সেবার এই প্রতিষ্ঠানটি ২৭ বছরে পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ পথচলা কেবল সময়ের হিসাব নয়; এটি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর এবং মানবিক বাংলাদেশ নির্মাণের এক নিরন্তর প্রয়াসের ইতিহাস।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন নামের সঙ্গে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম, আত্মনির্ভরতা, মানবকল্যাণ ও গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার আদর্শ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তবে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুর্যোগ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস কিংবা মহামারির মতো কঠিন সময়ে যেমন জেডআরএফ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তেমনি স্বাভাবিক সময়েও দরিদ্র, অসহায়, মেধাবী শিক্ষার্থী, কৃষক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে খুলনার দিঘুলিয়ায় মেডিক্যাল ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে যে মানবিক অভিযাত্রার সূচনা হয়েছিল, তা ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে নানা কর্মসূচিতে। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, কৃষকদের জন্য সুলভ মূল্যে উন্নত বীজের ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, গবাদিপশুর টিকাদান, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো—এসব উদ্যোগ জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনকে সাধারণ মানুষের কাছে একটি আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

মানব সেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করা। জেডআরএফ সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে সময়ের সঙ্গে নিজেদের কর্মকৌশলও পরিবর্তন করেছে। করোনা মহামারির ভয়াবহ সময়ে যখন মানুষ ঘর থেকে বের হতে ভয় পেয়েছে, তখনও অসহায় মানুষের কাছে খাদ্য, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। জীবন ও জীবিকার সংকটে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তখন হয়ে উঠেছিল মানবতার সবচেয়ে বড় পরিচয়। একটি সংগঠনের সাফল্য কেবল তার কর্মসূচির সংখ্যায় নয়; বরং মানুষের জীবনে সেই কর্মসূচির কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছে, তার ওপর নির্ভর করে। এই বিবেচনায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭ বছরের পথচলা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর প্রতিটি উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। বিশেষ করে সমাজের সেই মানুষ, যারা নিজেদের কথা বলার সুযোগ অনেক সময় পায় না।

এই দীর্ঘ যাত্রায় ফাউন্ডেশনের নেতৃত্ব ও পরিচালনায় যারা অবদান রেখেছেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষভাবে জেডআরএফের প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান এবং নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারের নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও মানবিক উদ্যোগ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেডআরএফের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক, সংগঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তাই শুধু আনন্দ ও উৎসবের উপলক্ষ নয়; এটি আত্মসমালোচনা, আত্মমূল্যায়ন এবং নতুন প্রত্যয় গ্রহণেরও সময়। গত ২৭ বছরে আমরা কী করেছি, কত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি এবং আগামী দিনে আরও কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়—এই প্রশ্নগুলো আমাদের সামনে নতুন দায়িত্বের দ্বার খুলে দেয়। এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের দায়িত্ব পাওয়া আমাদের জন্য যেমন সম্মানের, তেমনি বড় একটি দায়িত্বও। একটি সফল আয়োজনের পেছনে যে অসংখ্য মানুষের শ্রম, সময়, আন্তরিকতা ও সহযোগিতা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন উপকমিটির দায়িত্বশীল ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবক, শুভানুধ্যায়ী এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই আয়োজন সার্থক ও স্মরণীয় হয়ে উঠবে।

আমরা বিশ্বাস করি, মানবতার সেবা কোনো একদিনের কর্মসূচি নয়; এটি একটি নিরন্তর অঙ্গীকার। মানুষের দুঃখ-কষ্ট যতদিন থাকবে, ততদিন মানবিক মানুষের দায়িত্বও থাকবে। তাই ২৭ বছরের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত পরিসরে মানুষের পাশে দাঁড়াবে। আসুন, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই শুভক্ষণে আমরা সবাই নতুন করে অঙ্গীকার করি– দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাব, অসহায়ের পাশে দাঁড়াব, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার ও মর্যাদার জন্য কাজ করব এবং মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন একটি সমাজ গঠনে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখব। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭ বছরের এই পথচলা আরও দীর্ঘ, আরও গৌরবময় ও আরও মানবিক হোক।

সবশেষে এই বিশাল আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য যারা সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের বিগত দিনের কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে যারা স্মরণিকা প্রকাশে অবদান রেখেছেন তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোর্শেদ হাসান খান
আহবায়ক, ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটি
জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন



সদস্য সচিবের কথা



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারসহ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পরিচালক, উপদেষ্টা, কোঅর্ডিনেটর, মনিটর, স্বেচ্ছাসেবক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, শুভানুধ্যায়ী ও মানব সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন হাঁটি হাঁটি পা পা করে ২৭ বছর পেরিয়ে ২৮ বছরে পদার্পণ করছে। এই সময়ে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষ করে চিকিৎসক এবং কৃষিবিদ দুর্যোগ দূর্বিপাকে অসহায় মানুষের পাশে নিরলস শ্রম দিয়ে এসেছে। কোভিড নাইনটিনের মতো মহামারীর সময় তাদের অবদান ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। সেই দিক থেকে বলতে গেলে একটি প্রতিষ্ঠানের ২৭ বছর অতিক্রম করা নিছক সময়ের হিসাব নয়; এটি একটি আদর্শের বিকাশ, মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার এক দীর্ঘ পথচলার ইতিহাস। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭ বছরের অভিযাত্রা সেই মানবিক দায়বদ্ধতারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৯৯ সালে মানব সেবার মহান ব্রত নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠান অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে আসছে। অর্থের অভাবে যাঁরা চিকিৎসা নিতে পারেন না, দারিদ্র্যের কারণে যাদের শিক্ষার পথ বাধাগ্রস্ত হয়, কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে যারা হারিয়ে ফেলেন বেঁচে থাকার অবলম্বন–তাদের কাছে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য। মানব সেবার প্রকৃত অর্থ কেবল সাহায্য প্রদান নয়; মানুষের দুঃখকে নিজের দুঃখ হিসাবে উপলব্ধি করা, বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পথ সুগম করাও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন সেই দর্শনকে ধারণ করেই চিকিৎসাসেবা, শিক্ষাবৃত্তি, কৃষিসহায়তা, পশুসম্পদের সুরক্ষা এবং দুর্যোগকালীন সহায়তার মতো বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমানের মানবিক প্রত্যাশা এবং নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারের সাংগঠনিক ভূমিকা এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের নিষ্ঠা মানব সেবার এই ধারাকে আরও বিস্তৃত করার অনুপ্রেরণা জোগায়।

আমরা বিশ্বাস করি, মানব সেবার কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা, অসুস্থ মানুষের কষ্ট কিংবা দুর্যোগে বিপন্ন পরিবারের আর্তনাদ কোনো পরিচয়ের সীমারেখা মানে না। মানুষের বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানবতার সবচেয়ে বড় পরিচয়। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এই মূল্যবোধকে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যাশা আমাদের।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারা আমার জন্য গর্ব ও আনন্দের বিষয়। এই আয়োজন শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন নয়; বরং দীর্ঘ ২৭ বছরের মানবিক কার্যক্রমকে স্মরণ করা, সংশ্লিষ্ট সকলের অবদানকে সম্মান জানানো এবং আগামী দিনের জন্য নতুন অঙ্গীকার গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। এই স্মরণীয় আয়োজন সফল করতে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রম, সময়, মেধা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবক, সংগঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং মানবকল্যাণে বিশ্বাসী সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তোলে। ২৭ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে–মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজ কখনো শেষ হয় না। সমাজে এখনো অসংখ্য মানুষ রয়েছেন, যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন, শিক্ষার সুযোগ প্রয়োজন, জীবিকার সহায়তা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি প্রয়োজন একটু সহমর্মিতা। তাই আগামী দিনের পথচলায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনকে আরও সুসংগঠিত, কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রত্যাশা রাখি।

আমাদের অঙ্গীকার হোক–মানুষের সেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া, অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দেওয়া। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের প্রত্যয়–"মানুষের সেবাই হোক পরিচয়, মানবতাই হোক পথ চলার প্রেরণা।" এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ করে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাক মানবতার পথে, মানুষের কল্যাণে এবং একটি সহমর্মী ও মানবিক সমাজ গঠনের প্রত্যাশায়।

ফাউন্ডেশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আবারও আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা।

অধ্যাপক ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম
আহবায়ক, ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটি
জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদ



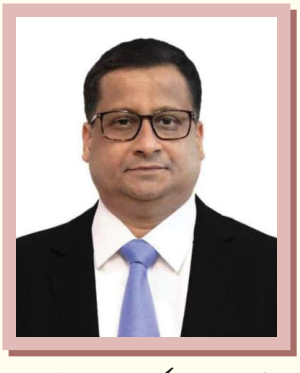
জনাব তারেক রহমান
প্রেসিডেন্ট



ডা. জুবাইদা রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট



অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার
এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর



অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান
ডাইরেক্টর (এডমিন)



অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম
ডাইরেক্টর (ফাইন্যান্স)



ডা. সৈয়দা তাজনীন ওয়ারিস সিমকী
ডাইরেক্টর (প্ল্যানিং)



ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ
ডাইরেক্টর (প্রোগ্রাম)



ডা. মোস্তফা আজিজ সুমন
ডাইরেক্টর (প্রোগ্রাম)



কৃষিবিদ ড. খন্দকার মাহফুজুল হক বাচ্চু
ডাইরেক্টর (প্রোগ্রাম)



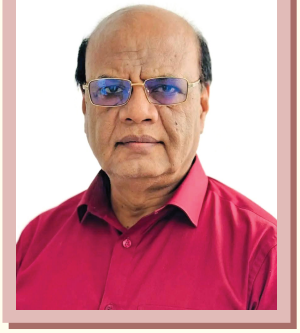
প্রকৌশলী মো. মাহবুব আলম
ডাইরেক্টর (প্রোগ্রাম)



অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান
ডাইরেক্টর (প্রোগ্রাম)



অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী
ডাইরেক্টর (প্রোগ্রাম)



আমিরুল ইসলাম কাগজী
ডাইরেক্টর (প্রোগ্রাম)



ব্যারিস্টার জাইমা রহমান
ডাইরেক্টর



অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম
ডাইরেক্টর



কৃষিবিদ আনোয়ারউননবী মজুমদার বাবলা
ডাইরেক্টর



কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম
ডাইরেক্টর



ব্যারিস্টার মীর হেলাল
ডাইরেক্টর



অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন
ডাইরেক্টর



প্রকৌশলী একেএম জহিরুল ইসলাম
ডাইরেক্টর



কৃষিবিদ শফিউল আলম দিদার
ডাইরেক্টর



প্রকৌশলী উমাশা উমায়ন মনি চৌধুরী
ডাইরেক্টর



সাংবাদিক হাফিজ আল আসাদ সাঈদ খান
ডাইরেক্টর

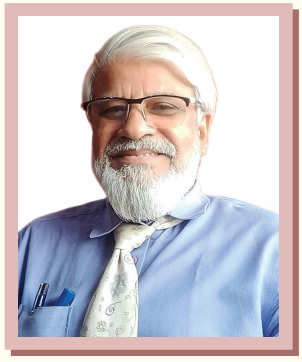
জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের
উপদেষ্টা পরিষদ



ডা. এ.এস. হায়দার পারভেজ
উপদেষ্টা



অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ
উপদেষ্টা



কৃষিবিদ অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম
উপদেষ্টা



অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রশিদ
উপদেষ্টা



ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম
উপদেষ্টা



অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী
উপদেষ্টা



প্রকৌশলী আলমগীর হাসিন আহমেদ
উপদেষ্টা

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটি

আহ্বায়ক : অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান

যুগ্ম আহ্বায়ক : ডা. মোস্তফা আজিজ সুমন
প্রফেসর ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম
প্রকৌশলী মো. মাহবুব আলম
ব্যারিস্টার মীর হেলাল
সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম কাগজী
কৃষিবিদ মো. শামীমুর রহমান শামীম

সদস্য সচিব : অধ্যাপক ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম

সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ডা. সৈয়দা তাজনিন ওয়ারিস সিমকী
প্রফেসর ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম
ডা. এ এস হায়দার পারভেজ
ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ
কৃষিবিদ ড. খন্দকার মাহফুজুল হক বাচ্চু
ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন অসীম
অধ্যাপক ড. মো. আল মুজাদ্দেদী আলফেসানি
অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী
প্রকৌশলী মো. এ কে এম জহিরুল ইসলাম
অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন
সাংবাদিক হাফিজ আল আসাদ সাঈদ খান
প্রকৌশলী উমাশা উমায়ন মনি চৌধরী
কৃষিবিদ মো. শফিউল আলম দিদার
অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান
অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা
ডা. পারভেজ রেজা কাকন
প্রকৌশলী রাজীব মাসুদুর রহমান
ডা. মেহেদী হাসান
ডা. মো. আনোয়ারুল ইসলাম
প্রকৌশলী শাহ আদনান মাহমুদ
রেজাউর রহমান চৌধুরী (সুমন)
অধ্যাপক ড. মো. আবু জাফর খান
ডা. এম আর হাসান
প্রকৌশলী মো. আতিকুল ইসলাম
কৃষিবিদ ড. মো. আকিকুল ইসলাম
ডা. সাঈদ ইমতিয়াজ উদ্দীন (সাজিদ)
অ্যাডভোকেট আশরাফ জালাল খান মনন
কৃষিবিদ সানোয়ার আলম
ব্যারিস্টার সৈয়দ ইজাজ কবির
ব্যারিস্টার ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী
অ্যাডভোকেট মনিরুল হাসান খান
ডা. জাহানারা লাইজু
প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসান সোহেল
ডা. তানজিম রুবাইয়াত আফিফ
সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম
প্রকৌশলী আসিফ হোসেন রচি
ডা. রাকিবুল ইসলাম আকাশ
ডা. আমিরুল ইসলাম পাভেল
প্রকৌশলী সায়েম শাহনেওয়াজ

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপ-কমিটি

অর্থ উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : ব্যারিস্টার মীর হেলাল উদ্দিন
সদস্য সচিব : অধ্যাপক ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম
সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
কৃষিবিদ আনোয়ারউননবী মজুমদার বাবলা
অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ
অধ্যাপক ড. মো. আবু জাফর খান
রেজাউর রহমান চৌধুরী (সুমন)
ব্যারিস্টার ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী
প্রকৌশলী সায়েম শাহনেয়াজ
অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী
ডা. মো. সালেহউদ্দিন সাঈদ

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান
সদস্য সচিব : অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ
সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ
প্রকৌশলী মাহবুব আলম
ডা. সিরাজুস সালেহীন প্রিন্স
ডা. এম আর হাসান
অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা
ব্যারিস্টার সৈয়দ ইজাজ কবির
কৃষিবিদ আকিকুল ইসলাম আকিক
অ্যাডভোকেট মনিরুল হাসান খান

প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : আমিরুল ইসলাম কাগজী
সদস্য সচিব : ডা. সাঈদ ইমতিয়াজ উদ্দীন (সাজিদ)
সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
প্রফেসর ড. শেখ মনির উদ্দিন
সাংবাদিক হাফিজ আল আসাদ সাঈদ খান
প্রকৌশলী রাজীব মাসুদুর রহমান
প্রকৌশলী উমাসা উমায়ন মনি চৌধুরী
প্রফেসর ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম
সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম
ডা. তানজিম রুবাইয়াত আফিফ
অধ্যাপক ড. আবু জাফর খান
সাংবাদিক রফিক লিটন

ভেন্যু নির্বাচন ও মঞ্চ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন অসীম
সদস্য সচিব : কৃষিবিদ মো. শামীমুর রহমান শামীম
সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
ডা. সাঈদ ইমতিয়াজ উদ্দীন (সাজিদ)
প্রকৌশলী শাহ আদনান মাহমুদ
প্রকৌশলী মেহেদী হাসান সোহেল
প্রকৌশলী আসিফ হোসেন রচি
কৃষিবিদ সানোয়ার আলম
ডা. তানজিম রুবাইয়াত আফিফ

শৃঙ্খলা উপ-কমিটি

আহ্বায়ক : অ্যাডভোকেট আশরাফ জালাল খান মনন
সদস্য সচিব : ডা. রাকিবুল ইসলাম আকাশ
সদস্যবৃন্দ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
প্রকৌশলী রাজীব মাসুদুর রহমান
কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম
কৃষিবিদ সানোয়ার আলম
ডা. আমিরুল ইসলাম পাভেল
ডা. মেহেদী হাসান
প্রকৌশলী মেহেদী হাসান সোহেল
কৃষিবিদ আব্দুল ওয়াহিদ মল্লিক



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-এর নেপথ্য কথা

অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার



বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ১৯৯৯ সালে চিন্তা করলেন, তাঁর বাবার নামে একটি ফাউন্ডেশন করবেন। নাম হবে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। সেই সময় তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ছিল–রাজনীতিকে রাজনীতির স্থানে রেখে, রাজনীতির বাইরে সাধারণ মানুষের জন্য কী করা যায়, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পদযাত্রা শুরু। তিনি প্রথমে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার দিঘুলিয়ায় একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প করেন। এই মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি চিন্তা করলেন–এ দেশের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে হলে তাদেরকে আর্থিকভাবে উন্নয়ন করতে হবে।

এ সময় তিনি সারা দেশের তৃণমূলের সংগঠন গোছাচ্ছিলেন। সারা দেশে তৃণমূল সমাবেশ করতেন। সেই সমাবেশের সময় পাশাপাশি তিনি প্রত্যেকটি জেলার প্রান্তিক মানুষকে হাঁস, মুরগি, গাছের চারা, গরু, ছাগল প্রভৃতি উপকরণ দিতেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল–এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তির আর্থিকভাবে উন্নতি সাধন হবে, সামাজিকভাবে সচ্ছল হবে এবং এর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক চাকা সচল হবে। এই প্রকল্প যে খুব একটা বড় ছিল তা কিন্তু নয়। তাঁর এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেখে দেখে অন্যরাও যাতে একই ধরনের কাজ করতে পারে এবং বাস্তবে তাই-ই দেখা গেছে। তিনি যখন থেকে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল–এগুলো দেয়া শুরু করলেন তখন অন্যান্য জায়গায় যেখানে আমাদের জেডআরএফ নেই, সেখানে মানুষ একই কায়দায় প্রান্তিক মানুষকে দান করতেন। এইভাবে তাঁর কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এই ফাউন্ডেশনের প্রথম যে কমিটি হয়েছিল–সেখানে তিনিই একমাত্র নন-ডাক্তার; বাকি ২১ জন ডাক্তার নিয়ে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রা বিরামহীন চলতে থাকে।

এরপর ১/১১ আসে। তিনি দেশের বাইরে চলে যান। দেশের বাইরে গিয়েও তিনি থেমে থাকেননি। তিনি দুটি অ্যাজমা কেয়ার সেন্টার সৃষ্টি করেছেন। এর একটি বগুড়ায় এবং অন্যটি চট্টগ্রামে। তিনি কমল বীজ প্রকল্প তৈরি করেছেন। এই কমল বীজ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল একজন চাষীকে উদ্বুদ্ধ করে কীভাবে কৃষক আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদ করে একই জমিতে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করতে পারেন। আমরা একজন কৃষককে নির্ধারণ করি। তারপর তাকে সার দেই, কখন নিড়াতে হবে, কখন পানি দিতে হবে, কখন আগাছা বাছাই করতে হবে–এইসব বিষয় কৃষককে আমরা শিক্ষা দিয়ে থাকি। ফলে একই জমিতে ফলন ২০-৩০ ভাগ বেড়ে যায়।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সেটা হলো দাসের কান্দি। ঢাকার খুব নিকটে। এখানে বার বার ডায়রিয়া হচ্ছিল। তিনি আমাদেরকে সেখানে পাঠালেন ডায়রিয়াতে মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমরা মেডিক্যাল ক্যাম্প করলাম। একবার, দুইবার, তিনবার সাহায্য করার পর তিনি ও আমরা চিন্তা করলাম, কেন সেখানে বার বার ডায়রিয়ায় মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। দেখা গেল যে, ঢাকা শহরের যতো সুয়ারেজ আছে সব ওইদিক থেকে বের হয় এবং এই সুয়ারেজের পানিতেই তারা হাঁড়ি-পাতিল ধোয়। তখন তিনি চিন্তা করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সাথে কথা বললেন। সেখানে একটি সমিতি করে দিয়ে 'কমল পানি' নামে একটি গভীর নলকূপ বসিয়ে দিলেন। তখন থেকে ওখানকার মানুষও গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করা শুরু করছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো গভীর নলকূপের পানি ব্যবহারের ফলে সেখানে ডায়রিয়া নেই বললেই চলে। এই পানিটাকেই বিভিন্ন খামারে ব্যবহার করা হচ্ছে। দূষিত পানি পান করলে মানুষের শরীর যেমন নষ্ট হয়, তেমনি পশু-পাখি দূষিত পানি খেলেও শরীর নষ্ট হয়।

অসচ্ছল মেধাবীদের পাশে

তারেক রহমানের নির্দেশে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ২০০৫ সালে চালু হয় বৃত্তি প্রদান প্রকল্প। আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ধরে রাখতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়। ২০০৫ সালে ঢাকার এলজিইডি ভবনে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই বৃত্তি প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে কিছুদিন কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও পরবর্তীতে এটি আরো বিস্তৃত পরিবারের মধ্যে চালু করা হয়। ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমানের দিক-নির্দেশনায় পুনরায় ২০২৩ সালে সারাদেশের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত বিএনপি নেতাকর্মীদের ১৯ জন সন্তানকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

অসহায় মানুষের স্বাস্থ্য সেবায়

দেশের যে কোনো দুর্যোগ সঙ্কটকালে ও জরুরি অবস্থায় জেডআরআফ নিয়মিত ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করে থাকে। এসব ক্যাম্পে রোগীদের সুচিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হয়। খুলনার রূপসা, ঢাকার যাত্রাবাড়ী,

করাইল বস্তি, গাজীপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও বগুড়ায় সম্প্রতি এসব সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে যারা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে এই ক্যাম্পগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফাউন্ডেশন-এর প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমানের পরামর্শে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান বগুড়ায় নিজ বাড়িতে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প করা হয়। গত বছর ১৮ অক্টোবর ফাউন্ডেশন-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সেই স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পে প্রায় ৭ হাজার রোগী সেবা গ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের চিকিৎসক এবং সদস্যরা সুবিশাল স্বাস্থ্য শিবিরের কাজ অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করেন। শীতের কারণে ঠাণ্ডাসহ চোখে আক্রান্ত মানুষকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ঢাকার কাকরাইল বস্তিতে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। সিলেটে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করে সেবা প্রদান করা হয় কয়েক হাজার রোগীকে।

স্বাভাবিক জীবনে ঠোঁটকাটা রোগী

জননেতা তারেক রহমানের আগ্রহে একটি বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে জেডআরএফ জার্মান বিশেষজ্ঞ সার্জনদের সহযোগিতায় বগুড়া, খুলনা এবং গাইবন্ধায় প্লাস্টিক ও রিকন্সট্রাকটিভ সার্জারি ক্যাম্প আয়োজন করে। এই ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৪৫০ জন ঠোঁটকাটা, তালুকাটা ও পোড়া রোগীকে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা হয়। আর্থিক অভাব বা চিকিৎসা সুবিধার অভাবে সার্জারি করতে না পারলেও এসব ক্যাম্পের মাধ্যমে অনেকেই নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। এখনও বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

অ্যাজমা রোগীদের সেবায়

বাংলাদেশের প্রায় ৭০ লাখ মানুষ অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত। এটি ২০০৩ সালের সরকারি হিসাবের ধারণা। একটি মাত্র সমন্বিত অ্যাজমা সেন্টারে এমন রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত সেবা পাওয়া কঠিন। এই প্রয়োজন অনুভব করে মানবিক তারেক রহমানের দিক-নির্দেশনায় ২০০৩ সালে বগুড়া এবং ২০০৪ সালের চট্টগ্রামে অ্যাজমা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। বগুড়ায় প্রায় ৫,৮৭১ জন এবং চট্টগ্রামে ৩,১১৯ জন রোগী সফল চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন। বর্তমানে এই সেবা চলমান রয়েছে।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন

মানবতার সেবক তারেক রহমানের দিক-নির্দেশনা ও তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা দুর্ঘটনার কারণে যারা হাত, পা হারিয়েছেন তাদের জন্য জেডআরএফ কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ সহযোগিতা চলছে এবং বহু মানুষ এর মাধ্যমে নতুন করে চলাফেরা ও কর্মজীবনে ফিরতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি জেডআরএফ শহীদ পরিবার, নিখোঁজ বা নির্যাতিত পরিবারের পাশে থেকেছে এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

বিশুদ্ধ কমল পানি সরবরাহ

ঢাকার দাসের কান্দি এলাকার মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানির সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। সেখানে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে পানি দূষণ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়। তারেক রহমানের নির্দেশে এই সমস্যার সমাধানে জেডআরএফ বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সহযোগিতায় কমল (শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ডাক নাম কমল সেই হিসাবে এই পানির নাম রাখা হয়েছে) পানি প্রকল্পটি চালু করে। প্রায় ১২০টি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় বিশুদ্ধ পানির সুবিধা পাচ্ছে। পাশাপাশি এখানে আরও ১৬০টি পরিবার ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করছে। এই উদ্যোগ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রেখে চলেছে।

কৃষকের কল্যাণে কমল বীজ

বাংলাদেশের কৃষকরা দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও মাত্র সাত শতাংশ কৃষক উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করেন, যা একটি বড় ঘাটতি। জনাব তারেক রহমানের নির্দেশে এই সমস্যা নিরসনে জেডআরএফ কমল বীজ প্রকল্প পুনরায় চালু করে। এ প্রকল্পে কৃষকদের উন্নতমানের বীজ সরবরাহের পাশাপাশি তাদের বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষির আধুনিককরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। করোনাকালে জেডআরএফ-এর কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। করোনা মহামারীর সময় জেডআরএফ ব্যাপক মানব সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানের নির্দেশনায় ফাউন্ডেশন বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেমন–

১. জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ : সারা বিশ্ব যখন করোনার মরণ থাবায় দিশেহারা, চারদিকে হাজারো মৃত্যুর মিছিল; বাংলাদেশ যখন বিপর্যস্ত, আতঙ্কিত, ছন্দময় জীবনে ঘটেছে ছন্দপতন, মানবিকতা হয়েছে বিপন্ন, তখন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করার মধ্য দিয়ে।

২. অক্সিজেন সরবরাহ : করোনা মহামারিকালে অসহায় জনগণের মাঝে বিনামূল্যে জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ ছিল ফাউন্ডেশন-এর উল্লেখযোগ্য কাজ। করোনা আক্রান্ত কোনো রোগীর স্বজন অক্সিজেনের জন্য ফাউন্ডেশন নির্ধারিত চিকিৎসকের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদেরকে অক্সিজেন সরবরাহ করা হতো।

৩. জরুরি হট লাইন স্বাস্থ্যসেবা চালু : বাংলাদেশ যখন এক ভয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষ যখন জীবন বাঁচানোর জন্য মরিয়া ঠিক তখনই তারেক রহমানের নির্দেশে জেডআরএফ ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ-ড্যাব যৌথভাবে এগিয়ে আসে। একদল অকুতোভয় চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে সাথে নিয়ে করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোনো পরামর্শ এবং প্রাথমিক জরুরি স্বাস্থ্য সেবার জন্য ২৪ ঘণ্টার মোবাইল হটলাইন সেবা চালু করা হয়। রোগের ধরন বুঝে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে ফোনে সংযুক্ত করার পাশাপাশি সমস্যা জেনে টেলিফোনে রোগীকে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়। মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে রোগীর চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে ঔষধ রোগীর বাড়ি পৌঁছে দেয়া হয়। এর জন্য একটি দিন বিনামূল্যে পৌঁছে দিয়ে সেবাদানে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া যারা খুব গরিব, যাদের ঔষধ কেনার সক্ষমতা নেই, তাদের জন্য ফ্রি ওষুধের ব্যবস্থাও করেছে ফাউন্ডেশন।

৪. প্রাইভেট মেডিকেলে পিপিই প্রদান : চীনের উয়ান প্রদেশে করোনার ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দেয়ার পর যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারদের পার্সোনাল প্রটেকটিভ (পিপিই) সরবরাহের বিষয়ে সরকারি হাসপাতালগুলো যেমন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তেমনি বেসরকারি হাসপাতালগুলো ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিল। সেখানে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেশের প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের জন্য কয়েক হাজার পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয়।

৫. স্বাস্থ্য সেবা ফেসবুক : বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ফাউন্ডেশন-এর প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমানের নির্দেশনায় বিশ্ব মহামারির সেই দুঃসময়ে জেডআরএফ জনগণের মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন ও নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। ধারাবাহিকভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন রোগ যেমন কিডনি সমস্যা, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের সমস্যা, প্রসূতি মায়ের শারীরিক সমস্যা, করোনা সংক্রমণকালে সৃষ্ট মানসিক সমস্যা, শিশুদের সুরক্ষা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ সবই ছিল স্বাস্থ্য সেবা ফেসবুক গ্রুপের লাইভ থেকে।

৬. হাত ধোয়া বেশিন প্রকল্প : জরুরি হট লাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি হাত ধোয়া সেবা দিতেও সাধারণ জনগণের পাশে ছিল জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতা আর দেশের মানুষের জন্য সীমাহীন ভালোবাসা নিয়ে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে গেছেন সম্মানিত সকল সদস্যগণ। তারেক রহমানের নির্দেশে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকার অন্যতম করণীয় সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ও বেশিন বসানো হয়েছিল সেই সময়।

৭. ডেঙ্গু জীবাণুমুক্তকরণ সেবা : বাংলাদেশের মূর্তিমান আতঙ্কের নাম ডেঙ্গু এবং এর ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় মানুষ যাতে করোনা ও ডেঙ্গু সৃষ্ট সমস্যা থেকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে, সেজন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন জরুরি হট লাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও হাত ধোয়া সেবার পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের কৃষিবিদ গ্রুপ জীবাণুমুক্তকরণ সেবা দিতে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে জীবাণুনাশক স্প্রে কার্যক্রম চালু করেছিল এবং এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে।

৮. স্বাস্থ্য সামগ্রী প্রদান : বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করে জেডআরএফ-এর সকল সদস্য করোনা মোকাবেলায় অক্লান্ত শ্রম দিয়েছিলেন। ফলে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন নিজ সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমলে নিয়েছে সবার আগে। সেই সময় বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কর্মরত জেডআরএফ-এর সম্মানিত সদস্যদের জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম করেছে। উল্লেখ্য, ঢাকা জেলার জন্য কুরিয়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য জেলায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী সকল সরঞ্জামাদি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। করোনা দুর্যোগের এই সময়ে ৭ জেলায় একত্রে বন্যা দেখা দিলে সেখানে খাদ্য বিতরণ করা হয় এবং বন্যার পর কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ করা হয়।

৯. টেলিমেডিসিন সেবা : করোনা আক্রমণের ভয়ে যখন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত, সকল ধরনের রোগীদের জন্য হাসপাতাল যাওয়া যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ তখন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক চালিত চব্বিশ ঘণ্টার টেলিমেডিসিন বিভিন্ন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম যেমন–মোবাইল, স্কাইপি, ফেসবুক ইত্যাদি ব্যবহার করে মানুষকে সেবা দিয়েছিল হতাশার সাগরে ছুটে চলা মানবতার এক রণতরি জেডআরএফ।

১০. হোম হেলথ সার্ভিস : জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ড্যাবের পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টার হোম হেলথ সার্ভিস কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। করোনাকালীন সময়ে যদি কোনো রোগীর অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের প্রয়োজন হয়, তবে সংশ্লিষ্ট পরিচালনা টিমকে টেলিফোনের মাধ্যমে অবহিত করলে রোগীর বাসায় এম্বুলেন্স পৌঁছে যেত। জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহের দরকার হলে উক্ত টিমের স্বাস্থ্য কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বাসায় তা পৌঁছে দিত। প্রয়োজনবোধে স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর ব্লাড প্রেসার, হার্ট রেট, পালস রেট, জ্বরের পরিমাণ এবং ব্লাড সুগার লেভেল নির্ণয় করে দিয়েছিলেন সেই সময়ে।

১১. বিজ্ঞান গবেষকদের মেলায় তারেক রহমান : তরুণদের মেধা ও মানসিক বিকাশের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন তারেক রহমান। করোনার সময় যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তালাবদ্ধ ছিল তখন আয়োজন করা হয় ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা। জেডআরএফ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাক্তার জুবাইদা রহমানের উদ্যোগে সফল ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করে জেডআরএফ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা তাদের সৃষ্টিশীলতা আর মেধা কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করে নিত্য নতুন প্রকল্প। তখন তারা এগুলো যখন ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিল তাদের চোখে মুখে যে আনন্দ সৃষ্টি হয়েছিল তা আমরা দেখেছিলাম। এই দৃশ্য চিরদিন মনে থাকবে। উপরোক্ত কার্যক্রম করোনাকালে মানুষের নিরাপত্তা সচেতনতা ও স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

দুর্যোগ দূর্বিপাকে জেডআরএফ

তারেক রহমানের নির্দেশে ২০২৪ সালে ফেনীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা, জুলাই আন্দোলনের সময় আহতদের চিকিৎসা সেবা, মাইলেস্টোন ট্রাজিটিতে দগ্ধ ছাত্র ও শিক্ষকদের সহায়তা, দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ, ডেঙ্গু ও অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, হৃদরোগ প্রতিরোধক প্রচারণা, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ঈদ উপহার ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান–এ সবের মধ্যে কিছু সাম্প্রতিক কার্যক্রম এখন তুলে ধরা হচ্ছে।

ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প

তারেক রহমানের দিক-নির্দেশনায় দেশব্যাপী ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করেছে ফাউন্ডেশন। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ আগস্ট ২০২৫ জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ময়মনসিংহ জেলার সুতিয়াখালী গ্রামের জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় স্থানীয় কৃষকদের মাঝে ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পে গ্রামের কৃষকের গবাদি পশুকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম বাঁশখালীতে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৫ নভেম্বর ২০২৫। এছাড়াও ৪ অক্টোবর ২০২৬

তারিখে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় অনুরূপ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষকদের মাঝে এডাব্লিউডি কিট বিতরণ করা হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি

যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা এবং পলিথিন ফেলে রাখার কারণে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। এইসব ময়লা-আবর্জনা গবাদি পশুর পেটে চলে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকারক জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং সেই মাংস মানব স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এজন্য তার নির্দেশে ফেনী, খুলনাসহ আরো বেশ কয়েক জায়গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হয়।

আইডিয়া ফেস্ট ২০২৫ মিনি হ্যাকাথন

বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায় 'তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ' শিরোনামে 'আইডিয়া ফেস্ট ২০২৫ মিনি হ্যাকাথন' তোমাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পাসে শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এসব সঙ্কট মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে তরুণদের। ফলে তাদের দক্ষ ও যোগ্য হিসাবে গড়ে তুলতেই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ অর্থাৎ তরুণরা যেন দেশের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্মাণ করতে পারে। এই 'আইডিয়া ফেস্ট'র মূল লক্ষ্যই সেটি। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডা. জুবাইদা রহমানের নির্দেশে এই ট্যালেন্ট হান্ট বা মিনি হ্যাকাথনের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীকালে এই সকল তরুণদের নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক উদ্যোগে যুক্ত জেডআরএফ

দেশের সীমানা পেরিয়ে জেডআরএফ আন্তর্জাতিকভাবে মানবিক উদ্যোগেও যুক্ত হয়েছে। তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় জেডআরএফের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি টিম ঢাকাস্থ তুরস্ক দূতাবাসে কম্বল হস্তান্তর করে।

পরিশেষে বলা যায়, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭ বছরের যাত্রা মূলত মানব কল্যাণ, সহমর্মিতা, উন্নয়ন ও সেবার ইতিহাস। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ পরিস্থিতি এবং মানবিকতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফাউন্ডেশন বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। মানবতার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এই সংগঠন ভবিষ্যতেও দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাবে। আরও বড় পরিসরে চলতে থাকবে আর্তমানবতার সেবা। মানবতাবাদী গুণে গুণান্বিত একজন তারেক রহমান যখন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এর কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ শহরের সকল জনসাধারণের জন্য ক্রমেই এই ফাউন্ডেশন তার কার্যক্রম বাড়িয়ে চলবে। বিভিন্ন পেশার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের সমন্বয় গঠিত একটি চৌকস টিমের মানব সেবার তীব্র আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে জনবান্ধব এই সকল কর্মসূচি অতীতের মতো ভবিষ্যতেও চলবে। আজ এই শুভদিনে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন–তিনি যেন আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখেন। আমরা জেডআরএফ-এর সকল সদস্য তারেক রহমানের মানবতাবাদী এই প্রতিষ্ঠানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তারেক রহমানের মানবতার দর্শনকে দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে আমরা নিয়োজিত রয়েছি।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন



মানুষের কল্যাণে রাজনীতি
শহীদ জিয়াউর রহমানের দর্শন ও জেডআরএফ-এর মানবিক অভিযাত্রা

অধ্যাপক ড. মোহা. হাছানাত আলী



কিছু মানুষ সময়ের সীমানায় আবদ্ধ থাকেন না। তাদের জীবন, কর্ম ও চিন্তা তাদের মৃত্যুর পরও মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। তাঁরা কেবল ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের নাম নন, বরং একটি দর্শন, একটি কর্মধারা এবং একটি স্বপ্নের প্রতীক হয়ে ওঠেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তেমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁর রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে ছিল বাংলাদেশ, আর বাংলাদেশের কেন্দ্রে ছিল সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর কমান্ডার, সেনাপ্রধান এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকারী জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত রাজনৈতিক চরিত্র। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরেও যে বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণীয়, তা হলো মানুষের কাছে যাওয়ার প্রবণতা এবং তৃণমূলের অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশকে শুধু শহর দিয়ে উন্নত করা যাবে না। বাংলাদেশের প্রাণ তার গ্রামে, তার কৃষকের ঘামে, তার মাটিতে, তার নদী-খালে, তার প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামে। তাই তাঁর উন্নয়নচিন্তার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল গ্রামবাংলা ও কৃষি। কৃষকের উৎপাদন বাড়ানো, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন, খাল খনন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করা এবং সাধারণ মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার নানা উদ্যোগ তাঁর কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তাঁর কাছে উন্নয়ন ছিল শুধু রাস্তা, সেতু কিংবা ভবন নির্মাণের নাম নয়। উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন। কৃষকের ঘরে স্বচ্ছলতা আসা, গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া, একজন মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারা। তাঁর কাছে এসবই ছিল উন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড। তিনি মনে করতেন, গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতও শক্ত হবে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। সেই বাস্তবতা থেকেই তিনি কৃষককে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসাবে দেখেছিলেন। মাঠে ফসল ফলানো কৃষকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সেচ, পানি ব্যবস্থাপনা ও খাল খননের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। একদিকে যেমন কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা, অন্যদিকে তৃণমূলের মানুষকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চিন্তা, এই দুইয়ের সমন্বয়ে তাঁর উন্নয়নদর্শনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল।

জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর তাঁর সহধর্মিণী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েও নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন উদ্যোগ গুরুত্ব পায়। নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার প্রসার একটি সমাজকে কীভাবে ভেতর থেকে পরিবর্তন করতে পারে, সেই উপলব্ধিও বাংলাদেশের উন্নয়নচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। তাঁদের সন্তান তারেক রহমানও জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন। তবে একটি রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরাধিকার কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারাবাহিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে না; মানুষের জন্য কাজ করার মধ্য দিয়েও সেই উত্তরাধিকারকে ধারণ করা যায়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতি, মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এবং তাঁর উন্নয়নচিন্তাকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন সেই মানবিক উত্তরাধিকারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে দেখা যায়, এটি কেবল কোনো আনুষ্ঠানিক স্মৃতিচর্চার প্রতিষ্ঠান নয়; বরং মানুষের প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি উদ্যোগ। রাজনীতির প্রচলিত কর্মসূচির বাইরে গিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবিক সহায়তা, পরিবেশ, বিজ্ঞান ও সামাজিক সচেতনতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সবচেয়ে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয়গুলোর একটি হলো স্বাস্থ্য। দরিদ্র মানুষের জন্য চিকিৎসা পাওয়া অনেক সময় এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ, নিম্ন আয়ের পরিবার কিংবা বস্তিবাসী মানুষের কাছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ সীমিত। এই বাস্তবতায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিভিন্ন এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চিকিৎসাসেবা দেওয়া, স্বাস্থ্যসচেতনতা তৈরি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঔষধ সরবরাহ করা এই সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। আর এসব উদ্যোগের মাধ্যমে চিকিৎসাকে প্রতিনিয়ত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনো কোনো প্রত্যন্ত এলাকায় একটি চিকিৎসা ক্যাম্প বসেছে, কখনো চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে মানুষের চোখ পরীক্ষা করা হয়েছে,

আবার কখনো অসহায় রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চোখের চিকিৎসা ও চক্ষু শিবির এ ধরনের মানবিক কার্যক্রমের একটি বিশেষ দিক। একজন দরিদ্র মানুষের চোখের আলো ফিরিয়ে দেওয়া মানে শুধু একজন ব্যক্তিকে চিকিৎসা দেওয়া নয়; তার সঙ্গে একটি পরিবারকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া। দৃষ্টিশক্তি হারানো একজন কৃষক যখন আবার নিজের জমিতে কাজ করতে পারেন, একজন শ্রমজীবী মানুষ যখন আবার উপার্জনের কাজে ফিরতে পারেন, তখন একটি ছোট চিকিৎসা উদ্যোগের সামাজিক মূল্য অনেক বড় হয়ে ওঠে।

স্বাস্থ্যসেবা শুধু রোগ হলে চিকিৎসা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা, রোগ প্রতিরোধ এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে শুধু হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা, বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা, জমে থাকা পানি অপসারণ এবং মানুষকে সচেতন করা জরুরি। এই উপলব্ধি থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোথাও স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়েছেন, কোথাও মানুষকে রোগ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বগুড়া ও গাবতলীতে হাসপাতাল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হওয়াও এই কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। একটি হাসপাতাল পরিচালনা করা শুধু একটি ভবন নির্মাণের বিষয় নয়; বরং এর সঙ্গে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রোগীর জন্য মানবিক পরিবেশ সবকিছুর সমন্বয় প্রয়োজন। এই ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করার যে প্রয়াস, তা ফাউন্ডেশনের মানবিক কর্মকাণ্ডকে আরও প্রত্যক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র শিক্ষা। দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুর হাতে বই পৌঁছায় না। অথচ একটি বই কখনো কখনো একটি শিশুর পুরো জীবন বদলে দিতে পারে। এই উপলব্ধি থেকে বস্তি ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার শিশুদের মধ্যে বই বিতরণের মতো কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। শহরের ঝলমলে জীবনের আড়ালে থাকা বস্তির শিশুরাও যে স্বপ্ন দেখতে পারে, তারাও যে ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী কিংবা সমাজের আলোকিত মানুষ হওয়ার অধিকার রাখে, বই তাদের সেই স্বপ্ন দেখার দরজা খুলে দেয়।

একটি শিশুর হাতে যখন নতুন বই তুলে দেওয়া হয়, তখন আসলে তার হাতে শুধু কয়েকটি মুদ্রিত পৃষ্ঠা দেওয়া হয় না; দেওয়া হয় জ্ঞান অর্জনের একটি সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ নির্মাণের একটি হাতিয়ার। যে শিশুর হয়তো বই কেনার সামর্থ্য নেই, তার চোখে একটি বই পাওয়ার আনন্দ তাই অনেক বড়। এই ছোট ছোট উদ্যোগের মধ্য দিয়েই সামাজিক বৈষম্যের দেয়ালে সামান্য হলেও ফাটল তৈরি করা যায়।

শীতের সময় অসহায় মানুষের কষ্ট আরও প্রকট হয়ে ওঠে। শহরের ফুটপাত, বস্তি কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে একটি কম্বল কিংবা শীতবস্ত্র তখন নিছক পোশাক নয় তা হয়ে ওঠে উষ্ণতার আশ্রয়। প্রতিবছর শীতকালে দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের মতো কর্মসূচি তাই মানবিক সহমর্মিতার একটি সরল কিন্তু গভীর প্রকাশ।

মানবিকতার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো তার জন্য সবসময় বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। একটি কম্বল, একটি বই, এক প্যাকেট ঔষধ, একটি চিকিৎসা পরামর্শ কিংবা একবেলা খাবারও কোনো কোনো মানুষের কাছে হয়ে উঠতে পারে বেঁচে থাকার সাহস। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই মানবিক দায়িত্ব আরও জরুরি হয়ে ওঠে। বন্যা বাংলাদেশের মানুষের কাছে নতুন কোনো দুর্যোগ নয়। নদীভাঙন, বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে প্রতিবছর বহু মানুষ ঘরবাড়ি, ফসল ও জীবিকার ক্ষতির মুখে পড়েন। দুর্যোগের সেই কঠিন সময়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো উদ্যোগ মানুষের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতারই বহিঃপ্রকাশ। একটি দুর্যোগের সময় মানুষ যখন নিজের ঘর হারায়, তখন তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয় পাশে দাঁড়ানো একজন মানুষের। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সমাজের সামর্থ্যবান মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ দুর্যোগকবলিত মানুষের কষ্ট অনেকটাই লাঘব করতে পারে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সেই বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো বিজ্ঞান মেলার আয়োজন এবং তরুণ বিজ্ঞানী খোঁজার উদ্যোগ। বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে মেধার কোনো অভাব নেই; অভাব অনেক সময় সুযোগের। একটি শিশু বা কিশোর যখন বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, নিজের হাতে কোনো মডেল তৈরি করে কিংবা কোনো সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান খোঁজে, তখন তার ভেতরে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীর সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে। বিজ্ঞান মেলা সেই সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসে। সেখানে শহরের নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর পাশাপাশি সাধারণ পরিবারের সন্তানও তার মেধা প্রদর্শনের সুযোগ পায়। একটি ছোট মডেল হয়তো জাতীয় পর্যায়ের কোনো বড় আবিষ্কারের সূচনা হতে পারে। একটি কিশোরের কৌতূহল হয়তো ভবিষ্যতের একজন গবেষকের জন্ম দিতে পারে। তরুণ বিজ্ঞানী খোঁজার এই উদ্যোগ তাই শুধু একটি মেলা আয়োজন নয়; এটি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য মেধা অন্বেষণের একটি প্রচেষ্টা। যে বাংলাদেশ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে চায়, সেই বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলা অপরিহার্য। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুদূষণ ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আজ শুধু কোনো একটি দেশের সমস্যা নয়; এটি সমগ্র পৃথিবীর সংকট।একটি গাছ হয়তো রাতারাতি পৃথিবী বদলে দিতে পারে না, কিন্তু হাজার হাজার গাছের সম্মিলিত সবুজ একদিন একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে পারে। বৃক্ষরোপণ তাই নিছক একটি কর্মসূচি নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটি অঙ্গীকার। আজ যে চারা রোপণ করা হচ্ছে, তার ছায়ায় হয়তো

আগামী দিনের কোনো শিশু দাঁড়াবে। যে গাছ আজ ছোট, কয়েক দশক পরে সেটিই হয়ে উঠবে পাখির আশ্রয়, পথিকের ছায়া এবং প্রকৃতির অক্সিজেনের উৎস। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি অভিন্ন সূত্র রয়েছে তা হলো মানুষকে কেন্দ্র করে কাজ করা। কোথাও স্বাস্থ্য, কোথাও শিক্ষা, কোথাও বিজ্ঞান, কোথাও পরিবেশ, কোথাও দুর্যোগে সহায়তা; ক্ষেত্র আলাদা হলেও লক্ষ্য একই। মানুষের জীবনকে একটু সহজ, একটু নিরাপদ এবং একটু সুন্দর করাই এসব কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। আর এখানেই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডকে গতানুগতিক রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। রাজনৈতিক দল সাধারণত রাষ্ট্রক্ষমতা, নির্বাচন, আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের কাছে যায়। কিন্তু একটি মানবিক ফাউন্ডেশন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট প্রয়োজনের কাছে যেতে পারে। সেখানে কোনো ভোটের হিসাব থাকে না; থাকে মানুষের কষ্ট বোঝার দায়বদ্ধতা।

স্বেচ্ছাসেবার এই সংস্কৃতিই একটি সমাজকে মানবিক করে তোলে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যখন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে অর্থ, শ্রম, মেধা ও সময় দেন, তখন সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী হয়। কেউ চিকিৎসক হিসাবে সেবা দেন, কেউ বই দেন, কেউ শীতবস্ত্র সংগ্রহ করেন, কেউ ত্রাণ পৌঁছে দেন, কেউ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন, কেউ বিজ্ঞান মেলায় তরুণদের উৎসাহ দেন। এভাবেই একজনের সামান্য উদ্যোগ অন্যজনের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের সঙ্গে এই মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর উন্নয়নচিন্তার কেন্দ্রে ছিল আত্মনির্ভরশীল মানুষ। কৃষককে উৎপাদনশীল করা, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং মানুষের নিজস্ব সক্ষমতাকে কাজে লাগানো। এসবের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে পরনির্ভরতা থেকে বের করে আনা। সেই দর্শনের মানবিক সম্প্রসারণ যেন অসহায় মানুষকে শুধু সাহায্য করা নয়, তাকে সক্ষম করে তোলা; অসুস্থ মানুষকে শুধু চিকিৎসা দেওয়া নয়, তাকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা; দরিদ্র শিশুকে শুধু একটি বই দেওয়া নয়, তার মধ্যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা; তরুণকে শুধু পুরস্কৃত করা নয়, তার মেধা ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

মানুষের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আসে তখনই, যখন সাহায্য তার সক্ষমতায় রূপ নেয়। সাময়িক সহায়তা মানুষকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে; কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস তাকে ভবিষ্যৎ নির্মাণের শক্তি দেয়। এই জায়গা থেকেই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কর্মসূচিকে একটি বৃহত্তর সামাজিক দর্শনের অংশ হিসেবে দেখা যায়। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সুবিধাবঞ্চিতদের সুযোগ তৈরি করা, স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করা, দুর্যোগে সহায়তা করা এবং পরিবেশ রক্ষায় মানুষকে সম্পৃক্ত করা এমন কল্যাণমূখী উদ্যোগ সমাজে একটি দায়িত্বশীল নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ইতিহাসের কোনো ব্যক্তিত্বকে শুধু স্মরণসভা, আলোচনা কিংবা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো যায়। কিন্তু তাঁর আদর্শকে ধারণ করতে হলে সেই আদর্শকে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সবচেয়ে কার্যকর পথও তাই হতে পারে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, স্বাবলম্বিতার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষকে সামনে এগিয়ে নেওয়া। কারণ শেষ পর্যন্ত একজন মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর পদ নয়, তাঁর রেখে যাওয়া মানুষের ভালোবাসা। একটি রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হয়, একটি রাজনৈতিক অধ্যায় শেষ হয়, কিন্তু মানুষের জন্য করা একটি ভালো কাজের স্মৃতি সহজে শেষ হয় না। একটি শিশুর হাতে তুলে দেওয়া বই হয়তো তার ভবিষ্যৎ বদলে দেবে। একটি শীতার্ত মানুষের গায়ে জড়ানো কম্বল হয়তো তাকে একটি রাতের কষ্ট থেকে রক্ষা করবে। একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প হয়তো কোনো অসুস্থ মানুষের জীবনকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেবে। একটি চক্ষু শিবির হয়তো কারও পৃথিবীকে আবার আলোয় ভরিয়ে দেবে। একটি বিজ্ঞান মেলা হয়তো ভবিষ্যতের কোনো বিজ্ঞানীকে আবিষ্কারের পথে নিয়ে যাবে। একটি বৃক্ষ হয়তো বহু বছর পর হাজার মানুষের ছায়ার আশ্রয় হবে। এই ছোট ছোট কাজগুলোর সমষ্টিই একদিন বড় সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করে। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনের মূল সুর যদি হয় মানুষকে শক্তিশালী করা, গ্রামকে শক্তিশালী করা, কৃষিকে শক্তিশালী করা এবং দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলা; তাহলে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মানবিক কর্মকাণ্ডের মূল সুরও যেন একই জায়গায় এসে মেলে। আর তা হলো মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের সক্ষমতা বাড়ানো এবং মানবিক বাংলাদেশ নির্মাণে অবদান রাখা।

রাজনীতি যদি মানুষের জন্য হয়, তবে তার শেষ ঠিকানাও মানুষের কাছে। উন্নয়ন যদি মানুষের জন্য হয়, তবে তার সুফলও পৌঁছাতে হবে মানুষের ঘরে। আর মানবিকতা যদি সত্যিই মানবিকতা হয়, তবে সেখানে কোনো বিভাজন থাকার কথা নয়। ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম, পরিচিত-অপরিচিত কিংবা সুবিধাপ্রাপ্ত-বঞ্চিতের কোনো দেয়াল থাকার কথা নয়। মানুষের দুঃখের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো, অন্ধকারে একটি আলো জ্বালানো, ক্ষুধার্তের মুখে খাবার তুলে দেওয়া, অসুস্থের পাশে বসা, শিশুর হাতে বই তুলে দেওয়া, তরুণের হাতে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ তুলে দেওয়া এবং প্রকৃতির জন্য একটি গাছ লাগানো এই ছোট ছোট মানবিক কাজের মধ্যেই একটি বড় স্বপ্নের বীজ নিহিত থাকে। আর সেই স্বপ্ন হলো একটি আত্মনির্ভর, মানবিক, জ্ঞানভিত্তিক ও কল্যাণমুখী বাংলাদেশ। আর তাই জিয়াউর রহমানের স্মৃতি যদি শুধু ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে সেই স্মৃতির সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ হবে মানুষের কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাওয়া। মানুষের জন্য রাজনীতি, মানুষের জন্য উন্নয়ন, মানুষের জন্য মানবিকতা এই তিনের সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে একটি সত্যিকার কল্যাণরাষ্ট্র। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের তৃণমূলমুখী উন্নয়নচিন্তা এবং জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মানবিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত বার্তাটি তাই একেবারেই স্পষ্ট। মানুষ বাঁচুক, মানুষ স্বাবলম্বী হোক, মানুষ আলোকিত হোক; আর উন্নয়নের শেষ ঠিকানা হোক মানুষের মুখের হাসি।

লেখক : উপাচার্য, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়



রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবতা, মানুষের পাশে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান



'মানুষের সেবাই হোক পরিচয়, মানবতাই হোক পথচলার প্রেরণা'–মানবতার সেবায় এক অনন্ত অঙ্গীকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজনীতিই একমাত্র পথ নয়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করতে, বিপদে এগিয়ে আসতে কিংবা অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় একটি মানবিক হৃদয়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ। কারণ মানব সেবা কোনো দল, মত কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানবতার প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তখনই, যখন একজন মানুষ অন্য মানুষের বিপদে নিজের সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসে। রাজনীতির বাইরেও যে মানুষের কল্যাণে অসামান্য অবদান রাখা যায়, তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন।

সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। কোনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা নিয়ে কাজ করে, কেউ স্বাস্থ্যসেবা, কেউ বা দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা দুর্যোগ মোকাবিলায়। কিন্তু একটি মানবিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পরিচয় কেবল তার ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং মানুষের দুঃসময়ে তার ভূমিকা, অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সক্ষমতা এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়েই তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের (জেডআরএফ) পথচলার দিকে তাকালে মানুষের পাশে থাকার এমন একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টার চিত্র ফুটে ওঠে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হৃদয়পটে। আর ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ এই চেষ্টার পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি আর কেউ নন; তিনি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একজন আপদমস্তক রাজনীতিক হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির কোনো আঁচ লাগতে দেননি তিনি। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেডআরএফ সেই ১৯৯৯ সাল থেকে অসহায় মানুষের সেবা দিয়ে আসছে।

খুলনার দিঘুলিয়ায় একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের মধ্য দিয়ে যে মানবিক উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল, তা সময়ের পরিক্রমায় বিস্তৃত হয়েছে বহুমাত্রিক সেবামূলক কার্যক্রমে। শুরুতে মানুষের চিকিৎসাসেবার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীকালে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাণিসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক সহায়তার নানা ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। এই বিস্তৃতির পেছনে রয়েছে একটি মৌলিক উপলব্ধি–মানুষের সমস্যা কখনো একক কোনো বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। একজন দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজন খাদ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষার সুযোগ এবং নিরাপদ জীবন-যাপনের পরিবেশ। দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানবতার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। মানব সেবার প্রকৃত পরীক্ষা হয় মানুষের দুঃসময়ে। স্বাভাবিক সময়ে সহানুভূতির কথা বলা সহজ, কিন্তু যখন চারদিকে বন্যার পানি, ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসযজ্ঞ, তখন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন সাহস, আন্তরিকতা এবং ত্যাগের মানসিকতা।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাসসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য মানুষ ঘরবাড়ি, ফসল, গবাদি পশু এবং জীবিকার অবলম্বন হারান। বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র মানুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে একটি দুর্যোগ শুধু কয়েক দিনের বিপর্যয় নয়; অনেক সময় তা হয়ে ওঠে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানে শুধু ত্রাণ বিতরণ নয়; বরং তাদের হারিয়ে যাওয়া জীবনে নতুন করে আশার আলো জ্বালানো। বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া, চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা কিংবা পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া ইত্যকার প্রতিটি কাজই মানবতার একেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মানবিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা। বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন দুর্গম এলাকায় মানুষের কাছে পৌঁছানোই হয়ে ওঠে বড় চ্যালেঞ্জ। এমন পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের কাছে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার মানসিকতা একটি প্রতিষ্ঠানের মানবিক অঙ্গীকারকে প্রকাশ করে। করোনা ভাইরাসের মহামারি মানবসভ্যতার জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। অদৃশ্য এক ভাইরাসের ভয়ে যখন মানুষ ঘরবন্দি, হাসপাতালগুলো চাপের মুখে, চিকিৎসাসেবা ব্যাহত এবং অসংখ্য পরিবার জীবিকা হারিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, তখন মানবিক সহায়তার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। এমন সঙ্কটকালে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসাসেবা ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব ছিল না, ছিল মানবিক সাহসিকতারও পরিচয়। দুর্যোগের সময় যারা মানুষের পাশে দাঁড়ান, তারা হয়তো কোনো পুরস্কার কিংবা স্বীকৃতির প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু যাদের জীবনে সেই সহায়তা নতুন করে বেঁচে থাকার সাহস জোগায়, তাদের কাছে এই উদ্যোগ কখনো বিস্মৃত হয় না।

শান্তির সময়েও মানুষের পাশে থাকার দায়বদ্ধতা : মানব সেবাকে কেবল দুর্যোগকালীন তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তার পূর্ণতা আসে না। কারণ মানুষের জীবনে সঙ্কট শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগে আসে না। দারিদ্র্য,

অসুস্থতা, শিক্ষার অভাব, কৃষিতে লোকসান কিংবা জীবিকার অনিশ্চয়তাও মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম। এসব সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক সহযোগিতা। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো স্বাভাবিক সময়েও সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রচেষ্টা। কারণ একটি প্রতিষ্ঠান তখনই মানুষের আস্থা অর্জন করে, যখন শুধু বিপর্যয়ের সময় নয়; বরং প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামেও তার কার্যক্রম মানুষের উপকারে আসে।

দরিদ্র পরিবারের একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর কাছে একটি বৃত্তি হয়তো সামান্য আর্থিক সহায়তা। কিন্তু সেই সহায়তাই তার শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার পথ খুলে দিতে পারে। যে শিক্ষার্থী অর্থের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করার কথা ভাবছিল, তার কাছে একটি বৃত্তি হয়ে উঠতে পারে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সাহস। আমাদের সমাজে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের প্রতিভা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসচ্ছলতা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ বাবার অসুস্থতার কারণে, কেউ পরিবারের অভাবের কারণে, আবার কেউ শিক্ষার ব্যয় বহন করতে না পেরে ঝরে পড়ে। অথচ এই শিক্ষার্থীদের অনেকেই ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠতে পারতো। তাই দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান নিছক অর্থসহায়তা নয়; এটি একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বিনিয়োগ। একজন শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়া মানে একটি পরিবারে সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া। একটি শিশুর শিক্ষার পথ সুগম করা মানে একটি সমাজকে আলোকিত করার ভিত্তি তৈরি করা। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠান যখন শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ায়, তখন সেই সহায়তার প্রভাব শুধু একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার পরিবার, ভবিষ্যৎ কর্মজীবন এবং বৃহত্তর সমাজও এর সুফল পেতে পারে।

অসহায় মানুষের চিকিৎসা : মানবিকতার সবচেয়ে স্পর্শকাতর অধ্যায় মানুষের জীবনে সবচেয়ে অসহায় মুহূর্তগুলোর একটি হলো অসুস্থতা। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে পুরো পরিবার যেন এক অনিশ্চিত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অর্থ নেই, ঔষধ কেনার টাকা নেই—এমন বাস্তবতায় অনেক মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। আমাদের দেশে এখনো চিকিৎসাসেবার ব্যয় অনেক পরিবারের জন্য বড় বোঝা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা, ঔষধ কিংবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ব্যয় বহন করা দরিদ্র মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা পাওয়ার আগেই রোগীর শারীরিক অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। এমন বাস্তবতায় অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে কিংবা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ মানবিক উদ্যোগ। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের চিকিৎসাসেবামূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব এখানেই। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কিংবা বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে চিকিৎসকদের মাধ্যমে অসহায় মানুষের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার উদ্যোগ মানবিক দায়বদ্ধতার একটি বাস্তব প্রকাশ।

একজন চিকিৎসক যখন নিজের পেশাগত দক্ষতা নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান, তখন তিনি শুধু চিকিৎসা দেন না; একজন বিপন্ন মানুষকে বেঁচে থাকার আশাও দেন। যে মা তার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাত কাটান, যে বৃদ্ধ অর্থের অভাবে চিকিৎসকের কাছে যেতে পারেন না, যে শ্রমজীবী মানুষ অসুস্থ হয়েও চিকিৎসা নিতে পারেন না—তাদের জন্য সামান্য চিকিৎসা সহায়তাও অনেক বড় প্রাপ্তি। মানবতার এ কাজ কোনো আর্থিক মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না। কারণ একটি অসহায় মানুষের সুস্থ হয়ে ওঠা তার পরিবারের জন্য যে আনন্দ ও স্বস্তি বয়ে আনে, তা যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনের চেয়ে গভীর।

কৃষকের পাশে দাঁড়ানো মানে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার পাশে দাঁড়ানো : বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজজীবনের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কৃষকের ঘামেই উৎপাদিত হয় আমাদের খাদ্য। অথচ সেই কৃষকই অনেক সময় উৎপাদন ব্যয়, উন্নত বীজের অভাব, সেচের সঙ্কট, রোগবালাই এবং বাজারের অনিশ্চয়তার কারণে নানা সমস্যায় পড়েন। বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকদের জন্য উন্নতমানের বীজ সংগ্রহ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। ভালো বীজের অভাবে ফসলের উৎপাদন কমে যায়, বাড়ে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি। একজন কৃষক যখন এক মৌসুমের ফসলের ওপর নির্ভর করে পুরো পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করেন, তখন তার উৎপাদন ব্যর্থ হওয়া মানে শুধু একটি ফসলের ক্ষতি নয়; পরিবারের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়া। এই বাস্তবতায় কৃষকদের সুলভ মূল্যে উন্নত বীজ সরবরাহের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কৃষি সহায়তামূলক কার্যক্রমের মধ্যে উন্নত বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের কাছে তা সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একজন কৃষককে সহায়তা করা মানে শুধু তার ব্যক্তিগত আয় বাড়াতে সহযোগিতা করা নয়; বরং দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখা। কারণ কৃষক ভালো ফসল উৎপাদন করতে পারলে তার পরিবার যেমন উপকৃত হয়, তেমনি উপকৃত হয় ভোক্তা, বাজার এবং সামগ্রিক অর্থনীতি। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কৃষককে শুধু সহায়তা নয়, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে হবে। উন্নত বীজ, সঠিক কৃষি পরামর্শ, পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা কৃষিকে আরও উৎপাদনশীল করে তুলতে পারে। ফাউন্ডেশনের এ ধরনের উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে মানুষের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

গবাদি পশুর টিকাদান নীরব অথচ গুরুত্বপূর্ণ মানব সেবা : গ্রামীণ অর্থনীতিতে গবাদি পশু শুধু সম্পদ নয়, অনেক পরিবারের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন। একটি গরু কিংবা ছাগল অনেক দরিদ্র পরিবারের কাছে সঞ্চয়ের মতো। সন্তানদের লেখাপড়া, চিকিৎসা কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে সেই পশু বিক্রি করেই তারা অর্থের সংস্থান করেন। কিন্তু রোগবালাইয়ের কারণে একটি পশু মারা গেলে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই পরিবার বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে। বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক খামারিদের পক্ষে পশুর চিকিৎসা কিংবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।

এখানে গবাদি পশুর টিকাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ। রোগ হওয়ার পর চিকিৎসার চেয়ে আগে থেকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে গবাদি পশুর টিকাদান ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সহযোগিতা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। একটি পরিবারের গবাদি পশু রক্ষা করা মানে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটি অংশ রক্ষা করা। এই সেবার মাধ্যমে মানবকল্যাণের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিকেও সহায়তা করা সম্ভব।

মানব সেবা কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের একক সম্পত্তি নয় : সমাজে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে, ভিন্ন চিন্তা ও আদর্শ থাকবে—এটাই গণতান্ত্রিক সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষের মৌলিক চাহিদা,

অসুস্থতার কষ্ট, ক্ষুধার যন্ত্রণা কিংবা দুর্যোগের বিপর্যয় কোনো রাজনৈতিক পরিচয় দেখে আসে না। বন্যার পানি যখন ঘরবাড়ি ডুবিয়ে দেয়, তখন পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় থাকে না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা অসহায় রোগীর কাছে সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন মানুষ। অর্থের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হতে বসা শিক্ষার্থীর কাছেও সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি সহযোগিতার হাত। এ কারণেই মানব সেবাকে রাজনৈতিক বিতর্কের সংকীর্ণ পরিসরে আটকে রাখা উচিত নয়। রাজনীতির বাইরে থেকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা যায় এবং মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব; জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সেই বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে। একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন হওয়া উচিত তার কাজের মাধ্যমে, মানুষের জীবনে তার অবদানের মাধ্যমে। কতজন অসহায় মানুষ চিকিৎসা পেলেন, কতজন শিক্ষার্থী নতুন করে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন, কতজন কৃষক উৎপাদনে সহায়তা পেলেন, কতগুলো পরিবার দুর্যোগের সময় সহযোগিতা পেল–এ সবই একটি প্রতিষ্ঠানের মানবিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

মানবিক নেতৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতার প্রয়োজন : কোনো মানবিক উদ্যোগ দীর্ঘদিন ধরে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন দূরদর্শী নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং মানুষের প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা এর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠানটির পথচলাকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রেখেছে।

ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান এবং নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারসহ সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটি প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব কেবল নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় অসংখ্য চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবক, সংগঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের। যারা নিজেদের সময়, শ্রম ও সামর্থ্য দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান, তারাই একটি মানবিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত শক্তি। মানব সেবার কাজ কখনো একক ব্যক্তির কৃতিত্বে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি একটি সম্মিলিত যাত্রা। একজন উদ্যোগ নেন, আরেকজন সহযোগিতা করেন, কেউ অর্থ দেন, কেউ শ্রম দেন, কেউ চিকিৎসা দেন, কেউ দুর্গম এলাকায় সহায়তা পৌঁছে দেন। এভাবেই একটি প্রতিষ্ঠান মানুষের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মানুষের আস্থাই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অর্জন : একটি প্রতিষ্ঠানের ভবন, সম্পদ কিংবা আনুষ্ঠানিক পরিচয় তার সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। মানুষের হৃদয়ে তার অবস্থান কতটা গভীর, সেটিই তার প্রকৃত অর্জনের অন্যতম মানদণ্ড। যে দরিদ্র শিক্ষার্থী একটি বৃত্তির কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছে, যে অসহায় রোগী চিকিৎসা পেয়ে সুস্থতার পথে ফিরেছে, যে কৃষক উন্নত বীজ পেয়ে ভালো ফসল ফলানোর সুযোগ পেয়েছেন, যে পরিবার গবাদি পশুর টিকা পেয়ে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে কিংবা যে দুর্যোগপীড়িত মানুষ বিপদের সময় সহযোগিতার হাত পেয়েছে–তাদের প্রত্যেকের জীবনে এই সহায়তার একটি নিজস্ব গল্প রয়েছে। এই গল্পগুলোই একটি প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি তৈরি করে।

কারণ মানুষের ভালোবাসা কখনো শুধু প্রচারণায় অর্জিত হয় না; অর্জিত হয় মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের জন্যও এই মানবিক আস্থাই হতে পারে সবচেয়ে বড় শক্তি। এই আস্থা ধরে রাখতে হলে সেবামূলক কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত, স্বচ্ছ, পরিকল্পিত এবং মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এগিয়ে নেওয়া জরুরি। আজকের বাংলাদেশে মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখে, তাহলে সমাজের অসংখ্য মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, মানবতার কোনো দলীয় পরিচয় নেই। মানুষের সেবা করার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় সেবার মানসিকতা। মানুষের কান্না মুছে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক পদ-পদবি লাগে না, লাগে একটি সহানুভূতিশীল হৃদয়। একজন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বড় কোনো আয়োজনেরও প্রয়োজন হয় না; কখনো একটি ঔষধ, কখনো একবেলার খাবার, কখনো একটি বৃত্তি, কখনো এক মুঠো উন্নত বীজ কিংবা একটি গবাদি পশুর টিকাই হয়ে উঠতে পারে একটি পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মানবিক কার্যক্রমের মূল দর্শনকে এভাবেই দেখা যায়–মানুষের বিপদে পাশে থাকা, মানুষের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়া এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে করোনার মতো মহামারিতে মানবিক সহায়তা, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, অসহায় মানুষের চিকিৎসাসেবা, প্রান্তিক কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহ এবং গবাদি পশুর টিকাদান–এসব উদ্যোগের প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে মানুষের জীবনকে একটু সহজ, একটু সুন্দর এবং একটু নিরাপদ করার প্রত্যয়। একটি শিশু যখন বৃত্তি পেয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শেখে, একজন অসুস্থ মানুষ যখন চিকিৎসা পেয়ে পরিবারের কাছে ফিরে যান, একজন কৃষক যখন ভালো ফসল ফলিয়ে হাসিমুখে ঘরে ফেরেন, কিংবা দুর্যোগে বিপন্ন কোনো পরিবার যখন সহায়তার হাত পায়, সেখানেই মানব সেবার প্রকৃত সার্থকতা। মানবতার ইতিহাসে বড় বড় অর্জনের পাশাপাশি এমন ছোট ছোট মানবিক উদ্যোগেরও বিশেষ স্থান রয়েছে। কারণ পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলে কেবল বড় বড় ঘোষণা নয়, মানুষের জন্য মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পথচলা তাই কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিবরণ নয়; এটি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক দীর্ঘ প্রত্যয়ের গল্প।

রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে মানুষের কল্যাণে কাজ করার যে দর্শন, তারই ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশনের এগিয়ে চলা। শেষ পর্যন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তার নাম কিংবা পদ-পদবিতে নয়, মানুষের জীবনে রেখে যাওয়া অবদানে। যে প্রতিষ্ঠান মানুষের দুঃসময়ে আশ্রয় হয়ে ওঠে, বিপন্ন মানুষের মুখে আশার আলো জ্বালায় এবং নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন দেখার পথ তৈরি করে, মানুষের হৃদয়ে তার স্থান তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবেই। কারণ মানুষের সেবা কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের বিষয় নয়; এটি মানবিকতার চিরন্তন দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন মানুষের কাছে একটি সেবামূলক ও মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষের জন্য কাজই হোক পরিচয়, মানুষের ভালোবাসাই হোক সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি।

লেখক : অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



পরিবেশ রক্ষায় জেডআরএফ-এর বৃক্ষরোপণ

অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান



বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মানবতাবাদী আদর্শকে এদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনাকে সামনে রেখে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুযোগ্য উত্তরসূরী জনাব তারেক রহমান ১৯৯৯ সালের ১৮ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ)। 'একটি উদ্যোগ একটু চেষ্টা, এনে দেবে স্বচ্ছলতা, দেশে আসবে স্বনির্ভরতা' এই স্লোগানকে ধারণ করে মানব সেবার মধ্য দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আজ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ সমাজসেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশের একদল তরুণ খ্যাতিমান ডাক্তার প্রথমে সংগঠনটির কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীকালে ডাক্তারদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হন প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক ও আইন পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ। রাজনীতির বাইরে থেকেও মানুষের জন্য, দেশের জন্য যে কাজ করা যায় তা জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে উপলব্ধি করাটা খুবই কঠিন।

সামাজিক ও মানব সেবা ধর্মী কর্মকাণ্ড ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও শাহাদাৎবার্ষিকী উদযাপনও ফাউন্ডেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবছর ৩০ মে ছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী। ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্য ও সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার ফরহাদ হালিম ডোনার ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে দেন। উক্ত কমিটির আহবায়ক ছিলাম আমি নিজে, অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন কৃষিবিদ বয়জার রহমান।

উদযাপন কমিটির প্রথম সভায় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার ফরহাদ আলিম ডোনার-এর পরামর্শক্রমে তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়–১. শাহাদাৎবার্ষিকীর দিন ৩০ মে সকাল দশটায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ। ২. ৩০ মে অথবা ২/৩ দিন পরে যে কোনো এতিমখানায় দোয়ার আয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত খাবার বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ৩. সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসাবে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন।

১. গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ মে ২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং সূরা ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে দোয়া করা। এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে দলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

২. শহীদ জিয়ার ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৩ জুন ২০২৬ তারিখ শনিবার দুপুরে ঢাকার পল্লবীতে অবস্থিত জামিয়া কুরবানিয়া তালিমিয়া মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানার তিনটি শাখায় মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত খাবার বিতরণ করা হয় এবং মাদ্রাসার তিনটি শাখায় কিছু প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বই প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন গঠিত উপ-কমিটির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার শাহীন হাওলাদার।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসাবে জেডআরএফ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। গত ১০ জুন ২০২৬ তারিখ জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকটি বৃক্ষরোপন করে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এবং কার্জন হলে অবস্থিত উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অডিটরিয়ামে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বৃক্ষ রোপনের গুরুত্বের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শের-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়। ২৫ জুন ২০২৬ তারিখ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার পাটুলি রহমত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিয়ারা জয়মনি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ১৫ শত ফলদ গাছের চারা বিতরণ করা হয় এবং একশত কৃষকের মাঝে ব্রি ধান ১০৩

বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আবদুল করিম।

একই দিনে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে ৫৫০টি ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এনামুল্ল্যাহ। ১ জুলাই ২০২৬ তারিখ পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ডিবুয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং ৬৫ নং মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপণ এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলদ ও ভেষজ গাছের ৬৫০টি চারা বিতরণ করা হয়। ২ জুলাই ২০২৬ তারিখ দিনাজপুর সদর উপজেলায় তফিউদ্দিন মেমোরিয়াল হাইস্কুলে ৩৫০টি ভেষজ ও ফলদ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। দিনাজপুর জেলা প্রশাসক জনাব মোফাজ্জল হোসেন দুলাল কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ৩ জুলাই ২০২৬ তারিখ চিটাগাং ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে হাটহাজারি ক্যাম্পাসে ১ হাজার ফলদ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মান্যবর ভূমি প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর হেলাল উদ্দিন। এ ছাড়াও বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে আট্টাকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০০ চারা বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি এস এম ফেরদৌস, মনিটর, খুলনা বিভাগ, জেডআরএফ এবং খুলনা সদরের মডেল মসজিদ ও বাটিয়া ঘাটার ফুলতলায় গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্য জনাব এজাজ খান। এ ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন গাছের ৫০০ চারা বিতরণ করা হয়।

সর্বশেষ গত ১০ জুলাই ২০২৬ তারিখ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বৃক্ষরোপণ এবং চারা বিতরণের মধ্য দিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জনাব জহির উদ্দিন স্বপন। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে সরকারের বৃক্ষরোপন কর্মসূচির নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করে তিনি মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন মনে করে প্রকৃতি ও মানুষের অস্তিত্ব একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব অপরিসীম। জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বায়ুদূষণ ও নির্বিচারে বন উজাড়ের ফলে প্রকৃতি আজ নানা সংকটের মুখোমুখি। এই বাস্তবতায় পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলার লক্ষ্যে জেড আর এফ আয়োজন করে মাসব্যাপী এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য কেবল গাছ লাগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশবিষয়ক সচেতনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিনির্ভর চিন্তাচেতনা গড়ে তোলাও এর অন্যতম লক্ষ্য। একটি গাছ কীভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, অক্সিজেন সরবরাহ করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে–এসব বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারবে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। গাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, চারার পরিচর্যা এবং পরিবেশের পরিবর্তন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু, পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব বিকশিত হবে। একইসঙ্গে তারা শিখবে, পরিবেশ রক্ষা কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়; এটি সবার সম্মিলিত কর্তব্য।

জেডআরএফ বিশ্বাস করে, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর। তাদের মধ্যে পরিবেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিকশিত করা গেলে একটি সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

জেডআরএফের মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি তাই নিছক একটি পরিবেশগত উদ্যোগ নয়; এটি সবুজ বাংলাদেশ গঠন এবং জ্ঞানভিত্তিক, বিজ্ঞানমনস্ক নতুন প্রজন্ম তৈরির একটি সুদূরপ্রসারী প্রয়াস। আজকের একটি চারা আগামী দিনের ছায়া, প্রাণ ও সম্ভাবনার প্রতীক। সম্মিলিত উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়ে উঠুক পরিবেশ সুরক্ষা ও আলোকিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের অনুপ্রেরণা।

ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজক উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম এবং কৃষিবিদ শফিউল আলম দিদার। গৃহীত সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান ও সদস্য সচিব কৃষিবিদ বয়জার রহমান এবং সার্বিক কর্মকাণ্ড তদারকি করেন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার ও পরিচালক (এডমিন) অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান।

লেখক : উপাচার্য, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি





আগামীর বাংলাদেশ : মেধার শক্তিতে নতুন উদ্ভাবন

ডা. সৈয়দা তাজনিন ওয়ারিস | অধ্যাপক ড. এস এম সোহাগ আওয়াল



আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রায় বিশ কোটি মানুষের এই জনবহুল দেশটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল রূপান্তরের মতো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে, এই অগ্রগতির পথে আমাদের সামনে অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। কৃষি থেকে স্বাস্থ্য, ট্রাফিক জ্যাম থেকে জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মসংস্থান থেকে কর্মমুখী শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তি– প্রতিটি সেক্টরেই রয়েছে নিজস্ব সমস্যা, যা আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এগুলোর জন্য প্রয়োজন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োজন তরুণদের সৃজনশীল চিন্তা।

তরুণদের সেই সৃজনশীল চিন্তা দেশের কাজে লাগানোর জন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় 'আইডিয়া ফেস্ট মিনি হ্যাকাথন-২০২৫'। ঢাকা শহরের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই আইডিয়া ফেস্টে অংশগ্রহণ করে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব। ১০০ টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন, রমজান এবং পরবর্তী ঈদুল আযহার কারণে বেশ কিছুদিন প্রতিযোগিতা আয়োজনের কাজ বিলম্বিত হয়। পরে অবশ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পরবর্তী সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল পর্ব সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায় পেরিয়ে ১৮টি দল সেমিফাইনালে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। পরবর্তী ধাপে সেখান থেকে সাতটি দল চূড়ান্ত পর্বে নিজেদের ধারণা উপস্থাপনের সুযোগ পায়। শেষ পর্যন্ত এই সাত দলের মধ্য থেকে তিনটি দল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। চ্যাম্পিয়ন দলটি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি টিম।

প্রতিযোগিতার চেয়ে বড় যে উদ্দেশ্য

হ্যাকাথন সাধারণত এমন একটি সৃজনশীল ও সমস্যা-সমাধানভিত্তিক আয়োজন, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো বাস্তব সমস্যার সমাধান হিসাবে নতুন ধারণা, প্রযুক্তিগত মডেল, সফটওয়্যার, প্রোটোটাইপ কিংবা বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করেন। আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তরুণদের গবেষণামুখী করে তোলার ক্ষেত্রে হ্যাকাথন একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে একটি মিনি হ্যাকাথনের গুরুত্ব কেবল নতুন প্রযুক্তি তৈরি কিংবা বিজয়ী নির্বাচন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বড় অর্জন হলো, তরুণদের চিন্তার জগৎকে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করা। পাঠ্যবইয়ে অর্জিত জ্ঞানকে কীভাবে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়, একটি সামাজিক সমস্যাকে কীভাবে তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় এবং সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে কার্যকর সমাধান তৈরি করা যায়–এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সুযোগ তৈরি হয় এমন আয়োজনে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের নিত্য নতুন আইডিয়া উপস্থাপনকালে বিচারকদের অনেক প্রশ্নের চমৎকার উত্তরও দিয়েছেন। কোথাও আটকে গেলে বিচারকরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানেই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের আইডিয়া ফেস্টের সার্থকতা। এটি তরুণদের শুধু নিজেদের মেধা প্রদর্শনের মঞ্চ নির্মাণ করে দেয়নি; একইসঙ্গে দেশ গঠনের প্রশ্নে তাদের চিন্তা ও দায়িত্ববোধকে সামনে আনার একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

মেধা যাচাইয়ের ধারাবাহিকতা

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি ধারণাকে প্রাথমিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত উপস্থাপনা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, দলগত কাজ, যুক্তি উপস্থাপন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রতিযোগিতার এমন ধাপভিত্তিক কাঠামো তরুণদের বুঝতে সাহায্য করে যে একটি ভালো ধারণা উপস্থাপন করাই যথেষ্ট নয়। ধারণাটির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, আর্থিক সম্ভাব্যতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং সামাজিক প্রভাবও বিবেচনা করতে হয়।

প্রশ্ন করা, প্রমাণ খোঁজা, সমাধান তৈরি করা

বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা কিংবা প্রযুক্তির ব্যবহার বোঝায় না। এর মূল ভিত্তি হলো যুক্তিনির্ভর চিন্তা, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন করার মানসিকতা, তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনে নিজের ধারণা সংশোধন করার সক্ষমতা।

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর শিষ্যদের বলতেন 'তোমরা প্রশ্ন করে যাও– উত্তরের অপেক্ষায় থেকো না।' জেডআরএফ এই প্রশ্ন করার প্লাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে। একজন তরুণ কোনো সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করবেন–সমস্যাটি আসলে কী? এর কারণ কোথায়? সমস্যাটি কত মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে?

বিদ্যমান সমাধানগুলো কেন যথেষ্ট নয়? নতুন প্রস্তাবটি কীভাবে কার্যকর হবে? এর সাফল্য পরিমাপ করা হবে কোন সূচকের ভিত্তিতে?

এই প্রশ্নগুলোই একটি সাধারণ ধারণাকে গবেষণাভিত্তিক উদ্ভাবনে পরিণত করতে পারে।

কোনো কোনো শিক্ষার্থী শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার একটি ধারণা উপস্থাপন করেছেন। এজন্য তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে বর্জ্যের পরিমাণ ও ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপর বর্জ্য পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার, জৈব বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট উৎপাদন কিংবা উপযুক্ত প্রযুক্তিতে শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাই করতে হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যয়, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিবেচনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছে।

একইভাবে কৃষিক্ষেত্রে পানি সাশ্রয়, রোগ শনাক্তকরণ কিংবা বাজারদর সম্পর্কে কৃষকদের তথ্য সরবরাহের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলে তার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য মাঠপর্যায়ের তথ্য, কৃষকের অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা মূল্যায়ন করে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটাই ছিলো মিনি হ্যাকাথন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। জেডআরএফ সেদিক থেকে সার্থক।

সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর

বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা, কৃষির উৎপাদনশীলতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং নাগরিক সেবার দক্ষতা বৃদ্ধি–প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন চিন্তা ও কার্যকর সমাধানের প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলোকে তরুণদের জন্য সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসাবেও দেখা যায়।

কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো গেলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানো এবং বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটাল উপকরণের পাশাপাশি স্থানীয় ভাষায় মানসম্মত শিক্ষাসামগ্রী তৈরি করা গেলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হতে পারে। স্বাস্থ্য খাতে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, রোগ সম্পর্কে সচেতনতা এবং চিকিৎসা-পরামর্শের সুযোগ সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে।

একইভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পানি সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিয়ে তরুণদের গবেষণা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি–প্রযুক্তি নিজে কোনো সমস্যার স্বয়ংক্রিয় সমাধান নয়। প্রযুক্তির পাশাপাশি মানুষের চাহিদা, সামাজিক বাস্তবতা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং নৈতিক দায়িত্ব বিবেচনা করতে হয়। কোনো উদ্ভাবন তখনই সফল হয়, যখন তা মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধান করে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রহণযোগ্য ও সাশ্রয়ী হয়।

আইডিয়া ফেস্টের মতো উদ্যোগ তরুণদের এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে উৎসাহিত করতে পারে।

আমাদের এই মিনি হ্যাকাথন এর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের বাস্তব ও কঠিন সমস্যাগুলোকে তরুণদের চোখ দিয়ে চিহ্নিত করা। তরুণদের দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলোর উদ্ভাবনী ও কার্যকর সমাধান চিন্তা করা। আজ তরুণরা যে ধারণার বীজ বপন করেছেন, তা আগামীতে একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তি হবে।

আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে তাদের কেবল প্রতিযোগী হিসাবে নয়, বরং আগামীর পরিবর্তন-প্রণেতা হিসাবে দেখতে চাই। আজ তরুণরা যে নতুন চিন্তা নিয়ে কাজ করবেন, তার মধ্যে দিয়েই জন্ম নেবে সেই সব সমাধান, যা আমাদের দেশকে সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে যাবে। তাদের সম্মিলিত মেধা ও প্রচেষ্টায় এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু অসাধারণ আইডিয়া উঠে এসেছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমাদের তরুণ সমাজ ও মেধাবীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও আইডিয়াকে অনুপ্রাণিত করতে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। দেশ গঠন এবং আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মেধা ও নতুন ভাবনার ভূমিকা অপরিসীম। "আইডিয়া ফেস্ট" তরুণদের জন্য এমনই এক ক্ষেত্র তৈরি করেছে, যেখানে তারা তাদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে দেশের কল্যাণে প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে।

আইডিয়া ফেস্ট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্বে যারা তাদের অনন্য আইডিয়া নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্থান করে নিয়েছেন, তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা। এই তরুণরাই আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও কারিগর।

ফ্যাসিবাদী শাসনামল থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্তি দিতে তরুণরা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে যে ভূমিকা রেখেছে, তা জাতি যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। সময়ের প্রয়োজনে সে সময় তরুণরা রাজপথে থাকলেও এখন কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সময়। সবার আগে বাংলাদেশ নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সময়। তাই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে তরুণদের ভূমিকা এখন রাজপথ থেকে পড়ার টেবিলে।

আজকের সুন্দর এই আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. ফরহাদ হালিম ডোনারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আসুন, আমরা সকলেই মেধা, উদ্ভাবন এবং ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

লেখক
ডা. সৈয়দা তাজনিন ওয়ারিস, ডাইরেক্টর জেডআরএফ।
অধ্যাপক ড. এস এম সোহাগ আওয়াল, মূখ্য সমন্বয়ক, এসডিজি।



জনকল্যাণ ও সফট পাওয়ার প্রেক্ষাপটে জেডআরএফ-এর নতুন পথরেখা

অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম



আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় জনকল্যাণের কাজ কেবল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর একক আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমকালীন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র, বাজার, সুশীল সমাজ, একাডেমি এবং জনহিতৈষী ফাউন্ডেশন (Philanthropic foundation) এই পাঁচটি প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক নতুন সামাজিক উন্নয়ন-পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

'অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (OECD)-এর সাম্প্রতিক উপাত্ত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, ২০২০ থেকে ২০২৩ সময়ে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক জনহিতৈষী এবং অলাভজনক তহবিল থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি ওই সময়ে প্রদত্ত মোট অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স (ODA)-এর প্রায় ১০ শতাংশের সমান।

এর মধ্যে স্বাস্থ্যখাত একাই অনুদানের প্রায় ৪০ শতাংশ অংশ নিয়েছে। সুতরাং, আধুনিক ফাউন্ডেশনকে শুধু ঐতিহ্যবাহী দানশীলতা বা পরোপকারের প্রতীক হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। সমকালীন প্রগতিশীল সমাজে একটি ফাউন্ডেশন অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। যেমন–জ্ঞান উৎপাদন ও নীতি সংস্কার (বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ও পরিপূরক হিসাবে গবেষণা পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণ ইত্যাদি), সামাজিক উদ্ভাবন (Social Innovation; যেমন–ধীরগতির প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিপরীতে দ্রুত ও পরীক্ষামূলক সামাজিক মডেল ইত্যাদি), মানবধন উন্নয়ন (যেমন–স্কলারশিপ, ফেলোশিপ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি বিনিয়োগ ইত্যাদি), আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং (বিশ্বজুড়ে একাডেমিক, সামাজিক ও নীতি-সংশ্লিষ্ট সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি)।

এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ নাই (Joseph Nye)-এর 'সফট পাওয়ার' (soft power) তত্ত্বটি বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। নাই-এর মত অনুযায়ী, কোনো রাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রভাব কেবল সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা নির্ভর করে তার সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ, গৃহীত নীতি ও আন্তর্জাতিক আকর্ষণের উপর। 'পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি' হলো সেই 'সফট পাওয়ার'কে বাস্তবে প্রয়োগ করার অন্যতম প্রধান রূপ।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ফাউন্ডেশন রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা কূটনৈতিক মিশনের বিকল্প হতে পারে না। এটি সরাসরি পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। তবে এর বিশ্বাসযোগ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মেধাভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ও আকর্ষণ বাড়াতে একটি অনুকূল অনুঘটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আধুনিক বিশ্বে ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার পেছনে সাধারণত পাঁচটি প্রধান সামাজিক ও কৌশলগত চালিকাশক্তি কাজ করে। যেমন–ক. জনকল্যাণ ও মানব সেবা : শিক্ষা, চিকিৎসা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পাশাপাশি পরিপূরক বেসরকারি সামাজিক মূলধন তৈরি করা। খ. জ্ঞান উৎপাদন ও গবেষণা : নিরপেক্ষ উচ্চতর গবেষণা, উদ্ভাবনী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও তরুণ গবেষকদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে মেধাকেন্দ্রিক সমাজ গঠন। গ. মানবধন সৃষ্টি : নেতৃত্ব বিকাশের প্ল্যাটফর্ম, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং গ্লোবাল স্কলারশিপের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক সক্ষমতা গড়ে তোলা। ঘ. সামাজিক উদ্ভাবনের নমনীয়তা : যেখানে সরকারি আমলাতন্ত্র দীর্ঘসূত্রতায় ভোগে, সেখানে ফাউন্ডেশন Innovational পাইলট প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রকফেলার এবং কার্নেগি ফাউন্ডেশন ঠিক এভাবেই নমনীয় আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কূটনীতি পরিচালনা করেছিল। ঙ. ঐতিহাসিক স্মৃতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ : রাজনৈতিক নেতা বা প্রথিতযশা চিন্তাবিদের আদর্শ, চিন্তা ও জীবন সংগ্রামকে ব্যক্তিগত বন্দনার ঊর্ধ্বে তুলে এনে সমাজকল্যাণমুখী স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা।

বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক ও রাজপুরুষদের স্মরণে গড়ে ওঠা ফাউন্ডেশনগুলো বৈশ্বিক স্তরে অনন্য প্রভাবশালী, গবেষণা ও চিন্তা 'মেধাভিত্তিক' পরিচিতি অর্জন করেছে।

দ্য কার্টার সেন্টার (The Carter Center) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার কর্তৃক ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি বিশ্বব্যাপী ডেমোক্রেসি, মানবাধিকার, দ্বন্দ্ব নিরসন এবং বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য খাতের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল হিসাবে বিবেচিত। 'দ্য কার্টার সেন্টার' ৯০টিরও বেশি দেশে জনস্বাস্থ্য ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেছে। এর মধ্যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানটি ৪০টি দেশে ১২৫টিরও বেশি পূর্ণ বা সীমিত মিশন পরিচালনা করে বৈশ্বিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে।

ওবামা ফাউন্ডেশন (Obama Foundation) : বারাক ওবামার প্রতিষ্ঠিত ওবামা ফাউন্ডেশনের প্রধান শক্তি হলো বৈশ্বিক 'ইয়ুথ লিডারশিপ নেটওয়ার্কিং'। এর 'Obama Leaders Programme' এশিয়া-প্যাসিফিক, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজ পরিবর্তনকারী তরুণ নেতৃত্ব গড়ে তুলছে। এটি প্রত্যক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার পরিবর্তে 'মানবধন নেটওয়ার্কিকরণ'-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সফট পাওয়ার অর্জন করেছে।

ক্লিনটন ফাউন্ডেশন এবং ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনস : ক্লিনটন ফাউন্ডেশন গ্লোবাল হেলথ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বহুমাত্রিক বিষয়ে পার্টনারশিপ মডেল হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেছে। অন্যদিকে জর্জ সোরোস প্রতিষ্ঠিত 'ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনস' (OSF) বিশ্বজুড়ে নাগরিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র চর্চায় আর্থিক অনুদান প্রদান করে। ২০২৩ সালে এটি ১০০টিরও অধিক দেশে অনুদান কার্যক্রম চালিয়েছে।

ফাউন্ডেশন এবং 'আন্তর্জাতিক পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি' : আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিসরে একটি ফাউন্ডেশন রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নির্মাণে তিনটি ধারাবাহিক স্তরে ভূমিকা পালন করে। যথা–১. প্রাথমিক লক্ষ্য (Primary Objective or Focus or Attraction) : উন্নত গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও সামাজিক কল্যাণ ও মানবিক সহায়তা। ২. নেটওয়ার্ক (Network) : বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষক, সিভিল সোসাইটি, উদ্ভাবক ও প্রবাসী জনশক্তি এবং ৩. বিশ্বাসযোগ্যতা (Credibility) : সুশাসন ও স্বচ্ছতা, পক্ষপাতহীন মেধা মূল্যায়ন ও স্বাতন্ত্র্য এবং ঐতিহাসিক সত্যতা।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (ZRF) হলো ১৮ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অরাজনৈতিক জনকল্যাণমূলক সংস্থা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ZRF-এর কার্যক্রম লক্ষ করলে বোঝা যায়, এটি চিরাচরিত সাহায্য বা ত্রাণ বিতরণের গণ্ডি ছাড়িয়ে আধুনিক বিজ্ঞান, পরিবেশ ও প্রযুক্তিনির্ভর তরুণ সমাজগঠনে মনোযোগ দিয়েছে : যেমন কমল ওয়াটার প্রজেক্ট, ভার্চুয়াল সায়েন্স ফেয়ার, আইডিয়া ফেস্ট, ফাইন্ডিং ফিউচার, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ, নিরাপদ সুপেয় পানীয় জল, তরুণদের উদ্ভাবনী মেধা ক্ষুদ্র হ্যাকাথন উদ্যোগ, তরুণ বিজ্ঞানীর খোঁজে 'বিজ্ঞান মেলা'। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ZRF কেবল স্মারক বা 'প্রথাগত জনকল্যাণমূলক' সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি বিজ্ঞান, সামাজিক উদ্ভাবন ও তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক দিকে বিস্তৃত হচ্ছে।

কিছু প্রস্তাব, কিছু মূল্যায়ন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) যুগে ZRF-এর প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের মডেল : ভবিষ্যৎমুখী আধুনিক গবেষণা ও মানবিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে ZRF-কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে নিচে দুটি বিশেষায়িত কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো :

প্রস্তাবনা এক : ZRF সেন্টার ফর এআই, ডেটা অ্যান্ড সোসাইটি : এটি একটি আধুনিক প্রযুক্তি গবেষণাগার হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে, যার মূল লক্ষ্য হবে–ক. বাংলা ভাষা প্রযুক্তি ও দায়িত্বশীল AI : বাংলা প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP) এবং ডেটা সেটে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার গবেষণা। খ. কৃষি ও জলবায়ু ডেটা বিশ্লেষণ : দক্ষিণ এশীয় ব-দ্বীপীয় পরিবেশ ও বন্যা পূর্বাভাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ। গ. জনস্বাস্থ্য ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি : গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় এআইভিত্তিক স্ক্রিনিং ও টেলি-মেডিসিন উদ্ভাবন।

প্রস্তাবনা দুই : সাইন্স, ইনোভেশন অ্যান্ড স্টার্টআপ ডিভিশন : বিজ্ঞান মেলায় বিজয়ী আইডিয়াগুলোকে টেকসই রূপ দিতে তিনটি স্তরে সাজানো যেতে পারে; স্টার্টআপ ইনকিউবেশনের আওতায় তরুণ উদ্ভাবকদের মেধাস্বত্ব (Intellectual Property), আন্তর্জাতিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংযোগ এবং পেটেন্ট অর্জনে সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

ZRF 'গ্লোবাল রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা : একটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্মৃতিবিজড়িত ফাউন্ডেশনকে আন্তর্জাতিক মেধাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা প্রদানের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা উইং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যার নাম হতে পারে, 'ZRF Global Research & Policy Institute'। এখানে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক বিষয়াবলির আলোকে, পরিবর্তনশীল বিশ্ববাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বা 'হেলথ সিকিউরিটি', 'জলবায়ু ও পরিবেশ', জলবায়ু পরিবর্তন, পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবে ক্রিয়াশীল ('ফাংশনাল') ও গুরুত্বপূর্ণ 'কালচারাল ডিপ্লোম্যাসি', জনস্বাস্থ্য, গ্লোবাল হেলথ ডিপ্লম্যাসি, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল জগতের নিত্য নতুন চিন্তাধারা, কৌশলগত অঞ্চল ও আঞ্চলিক বিষয়াদি, শাসনব্যবস্থার নীতি ইত্যাদি সময়োপযোগী এবং বাংলাদেশের স্বার্থ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে গবেষণা চালানো যেতে পারে।

জিয়াউর রহমানের 'আন্তর্জাতিক উত্তরাধিকার' ও 'ঐতিহাসিক গবেষণাগার' : জিয়াউর রহমানের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নীতি পর্যালোচনায় গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই ব্যক্তিগত অনুমানের বাইরে গিয়ে নথিপত্রভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ একাডেমিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে'র গবেষণায়, সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM), ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) এবং আঞ্চলিক সহযোগিতায় (SAARC-এর রূপরেখা) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গতিপথ পরিবর্তন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ZRF ফরেন পলিসি আর্কাইভ গঠন : এই লক্ষ্যে একটি বিশ্বমানের ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে সংরক্ষিত থাকবে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জিয়াউর রহমানের ভাষণ ও কূটনৈতিক চিঠিপত্র। সাউথ এশিয়ান রিজিয়নাল কো-অপারেশন (SAARC) গঠনের প্রাথমিক সরকারি নথি ও স্মারকলিপি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের ডিজিটাল কাটিং, অডিও-ভিজ্যুয়াল রেকর্ড এবং সাক্ষাৎকার। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক কূটনীতিকদের আত্মজীবনী ও নীতি বিশ্লেষণ।

জিয়াউর রহমানের 'উত্তরাধিকার' থেকে বাংলাদেশের 'সফট পাওয়ার' রূপরেখা : ক. জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক রেকর্ড (উন্নয়ন, কূটনীতি, স্বনির্ভর কৃষি, সার্ক), খ. গবেষণা ও প্রাথমিক দলিল নথিভুক্তকরণ, গ. আন্তর্জাতিক একাডেমিক সেমিনার ও বিনিময়, ঘ. তরুণদের বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব ও বৃত্তি এবং ঙ. বাংলাদেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি ও আস্থা।

রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড ঘিরে কীভাবে বাংলাদেশের স্থায়ী সফট পাওয়ার গড়ে তোলা যায় :

ZRF গ্লোবাল ফেলোশিপ ও ইয়ুথ লিডারশিপ প্রোগ্রাম

আন্তর্জাতিক মেধা বিনিময়ের লক্ষ্যে ZRF দুটি কার্যকর ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ নিতে পারে–১. ZRF গ্লোবাল ফেলোশিপ : প্রতি বছর বাংলাদেশ ও বিদেশের তরুণ এবং মধ্য পর্যায়ের গবেষকদের জন্য স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা ফেলোশিপ চালু করা। গবেষণার ক্ষেত্র : বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রি, উন্নয়ন অর্থনীতি, ক্লাইমেট মাইগ্রেশন এবং পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ। নেটওয়ার্ক প্রভাব : বিদেশি স্কলাররা বাংলাদেশে গবেষণা করলে এবং বাংলাদেশি গবেষকরা আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করলে একটি টেকসই দ্বিপাক্ষিক জ্ঞান-নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। ২. ZRF গ্লোবাল লিডারশিপ প্রোগ্রাম : (নৈতিক নেতৃত্ব থেকে জননীতি ও অর্থনীতি; জননীতি ও অর্থনীতি থেকে ডিজিটাল কূটনীতি; ডিজিটাল কূটনীতি থেকে কমিউনিটি সার্ভিস)। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী উদীয়মান তরুণদের নিয়ে দলীয় রাজনীতিমুক্ত একটি লিডারশিপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা, যা ওবামা ফাউন্ডেশনের লিডারশিপ মডেলের আদলে সাজানো যেতে পারে।

'ডিজিটাল হেরিটেজ মিউজিয়াম' ও আন্তর্জাতিক প্রচার

ডিজিটাল যুগে বিশ্ব দরবারে তথ্য পৌঁছে দিতে একটি বহুভাষিক (বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও ফরাসি) 'Ziaur Rahman Digital Museum' তৈরি করা জরুরি। ডিজিটাল মিউজিয়াম : অনুসন্ধানযোগ্য সংবাদ আর্কাইভ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর দলিল অনুসন্ধান ইঞ্জিন (AI Search Engine), অডিও-ভিজ্যুয়াল রেকর্ড ও ঐতিহাসিক মানচিত্র, ইন্টারেক্টিভ কূটনীতি মানচিত্র (ডিজিটাল আর্কাইভের প্রযুক্তিগত কাঠামো নির্মাণ করতে হবে)।

আন্তর্জাতিকতা ও প্রবাসী নেটওয়ার্কিং

বাংলাদেশের সফট পাওয়ার অর্জনে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশি দক্ষ পেশাজীবীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ZRF একটি 'Global Bangladeshi Professionals Network' গড়ে তুলতে পারে, যা একত্র করবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সিলিকন ভ্যালি ও বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিজ্ঞানী, বৈশ্বিক উদ্যোক্তা ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ইত্যাদি। 'রাজনৈতিক পরিচয়'কে প্রাধান্য না দিয়ে কেবল মেধা ও পেশাগত দক্ষতাকে মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করলে এই নেটওয়ার্কটি দেশে 'প্রযুক্তি স্থানান্তর' (technology transfer) ও 'জ্ঞানভিত্তিক স্বনির্ভরতা' নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

হেলথ অ্যান্ড ক্লাইমেট ডিপ্লোম্যাসি : মানবিক দৃষ্টান্ত; যেমন–কার্টার সেন্টারের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, দীর্ঘমেয়াদি সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণ বা গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবিক আস্থা অর্জন সম্ভব।

ZRF মানবিক ও বৈশ্বিক উদ্যোগসমূহ

ZRF গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স : গ্রামীণ টেলি-মেডিসিন ব্যবস্থা, উপকূলীয় কৃষি ও ডেল্টা গবেষণা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ম্যানগ্রোভ ও পরিবেশ সংরক্ষণ, জরুরি দুর্যোগকালীন চিকিৎসা টিম, সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্প (কমল)।

রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা এবং ঐতিহাসিক স্মৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

ZRF-এর সামনে সর্বাধিক কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক পরিচয় ও স্বায়ত্তশাসিত সুশীল প্রতিষ্ঠানের সীমারেখা চিহ্নিত করা। জিয়াউর রহমান-এর নামে নিবন্ধিত ফাউন্ডেশন তার 'ঐতিহাসিক অবদান' সম্পর্কে দলিলভিত্তিক গবেষণা চালাতে পারে; তবে স্কলারশিপ, চিকিৎসা সেবা, খাদ্য বিতরণ কিংবা মেধা প্রতিযোগিতায় যে কোনো ধরনের দলীয় বা রাজনৈতিক বিবেচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকতে হবে। এই 'নিরপেক্ষতাই' ফাউন্ডেশনটির সর্বজনীন বৈধতা নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক অনুদানে এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে 'Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act, 2016' কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। আন্তর্জাতিক পরিধি সম্প্রসারণের জন্য ZRF-কে একটি অভ্যন্তরীণ 'Legal Compliance Unit' গড়ে তুলতে হবে, যার মূল দায়িত্ব হবে আন্তর্জাতিক 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুসরণ' (AML Compliance), দাতা সংস্থার স্বচ্ছতা ও ডোনার ডিসক্লোজার নীতিমালা, সাইবার নিরাপত্তা ও উপাত্ত সুরক্ষা নীতি (Data Protection Policy), আন্তর্জাতিক স্বাধীন অডিট ফার্ম দ্বারা প্রস্তুতকৃত আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট, প্রকল্পভিত্তিক সুবিধাভোগী ও ভৌগোলিক বিস্তৃতির বিস্তারিত বিবরণ এবং Measurable Impact বা পরিমাপযোগ্য সামাজিক ফলাফলের উপাত্ত নিশ্চিত করা।

একটি আধুনিক বিশ্বমানের মেধাভিত্তিক ফাউন্ডেশন হিসাবে ZRF-কে সম্ভাব্য কিছু আন্তর্জাতিক মৌলিক প্রশাসনিক কাঠামো বা বিভাগ বা কর্মবিভাগ গ্রহণ করতে হবে। যেমন–গবেষণা ও পলিসি, এআই ও ডেটা সায়েন্স, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন, শিক্ষা ও ফেলোশিপ, জলবায়ু ও পরিবেশ, গ্রামীণ উন্নয়ন, গ্লোবাল লিডারশিপ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ডিজিটাল হেরিটেজ, একাডেমি ও ডিপ্লোম্যাসি, আর্কাইভ মডেল, মান নিয়ন্ত্রণ, অডিট ও কমপ্লায়েন্স ইউনিট ইত্যাদি। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফাউন্ডেশনের কাঠামো ও পরিচালনার নীতি, সংযোজন বা বিয়োজন ইত্যাদি ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

সফট পাওয়ারের মৌলিক মূলনীতি : 'প্রচার নয়, প্রমাণ'

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়াতে হলে কেবল স্তুতিসূচক স্লোগান বা ব্যক্তিগত বন্দনাভিত্তিক প্রচার কোনো দৃশ্যমান ফলাফল আনবে না। আন্তর্জাতিক মেধা সমাজ ও নীতি নির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক গতিপথ অনুসরণ করতে হবে। একজন আন্তর্জাতিক গবেষক যদি ZRF ডিজিটাল আর্কাইভে এসে বাংলাদেশের সত্তরের দশকের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক প্রাথমিক দলিল পান, কিংবা একজন সাউথ এশিয়ান শিক্ষার্থী যদি ZRF স্কলারশিপ পান–তবেই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি টেকসই মেধাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করবে। তিন ধাপে কাজগুলো হতে পারে, যেমন–

ফেজ-১ : প্রাতিষ্ঠানিক সংহতকরণ : সুশাসন সংস্কার ও ডিজিটাল আর্কাইভ নির্মাণ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অডিট ও এআই ডিভিশন গঠন।

ফেজ-২ : জাতীয় বিস্তার : জেলা পর্যায়ে ইনোভেশন হাব ও ফেলোশিপ কার্যক্রম চালু করা, স্টার্টআপ ইনকিউবেশন এবং গ্রামীণ ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা।

ফেজ-৩ : বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ : গ্লোবাল ফেলোশিপ ও আন্তর্জাতিক একাডেমিক সম্মেলন, গ্লোবাল ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক ও জলবায়ু কূটনীতি কেন্দ্র।

মেধা ও সেবার আন্তর্জাতিক নির্ভরযোগ্যতা

স্মৃতিভিত্তিক একটি ফাউন্ডেশনের প্রকৃত উৎকর্ষ কেবল তার ঐতিহাসিক নামের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না; বরং তা নির্ভর করে সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে কীভাবে টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায়, গবেষণাকে জনসেবায় এবং সেবাকে আন্তর্জাতিক আস্থায় রূপান্তর করা যায় সেই সক্ষমতার ওপর।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক কার্যক্রমে বিজ্ঞান মেলা, আইডিয়া ফেস্ট, রোবোটিক্স, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুপেয় পানির মতো প্রগতিশীল উদ্যোগ প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির পথ দেখিয়ে দেয়। পরবর্তী মেয়াদের চ্যালেঞ্জ হলো এই বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমগুলোকে একটি সমন্বিত বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা।

দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি টেকসই ও আধুনিক রূপকল্প হতে পারে, 'Memory into Knowledge, Knowledge into Service, Service into Trust' (স্মৃতিকে জ্ঞানে, জ্ঞানকে সেবায় এবং সেবাকে আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতায় রূপান্তর)। রাজনৈতিক প্রচারের প্রতিকূল পথ এড়িয়ে গবেষণার স্বাধীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, মেধার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বকে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন কেবল একটি দেশীয় স্মারক সংগঠন হয়ে থাকবে না; বরং বাংলাদেশকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক মেধা, প্রযুক্তি ও মানবিক সেবার এক অনন্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত হতে পারবে।

লেখক : উপাচার্য, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডাইরেক্টর (ফিন্যান্স), জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন



সেবার ব্রতে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ১৯৯৯ সালের ১৪ এপ্রিল, (১লা বৈশাখ) খুলনা জেলার দিঘুলিয়া ও রূপসা থানায় আয়োজিত স্বাস্থ্যমেলার সফল আয়োজন দিয়ে যাত্রা শুরু হয় এই সংগঠনের। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (ZRF) তরুণ প্রজন্মের মাঝে বিজ্ঞান সচেতনতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব গড়ে তুলতে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে। বিজ্ঞান মেলায় দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট, মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রদর্শন করার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে বিজ্ঞানের বাস্তবিক প্রয়োগ শিখতে এই আয়োজন বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। বিজ্ঞান মেলায় সেরা ও সম্ভাবনাময় প্রজেক্ট এবং তরুণ উদ্ভাবকদের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার, স্মারক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। দেশের বিজ্ঞানচর্চার প্রসার এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে গবেষণাধর্মী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। সমানাধিকার, মর্যাদা ও সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চাই যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত করতে এবং মানবতার কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ক. স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ (চিকিৎসা সহায়তা এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদান), খ. পানি সংরক্ষণ উদ্যোগ (নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদান), গ. স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি (বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকদের নিযুক্ত করা), ঘ. সবার জন্য শিক্ষা (অস্বচ্ছল শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রদান), ঙ. বন সংরক্ষণ কর্মসূচি (বন সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অংশগ্রহণ), চ. ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন (অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান), ছ. কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (কৃষকদের সহায়তা করা এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদান করা), জ. লাইব্রেরি পরিষেবা (গ্রামীণ এলাকায় লাইব্রেরি ও শিক্ষা সম্পদ তৈরি করা), ঝ. গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সহায়তা (আন্দোলনে পঙ্গুত্ববরণকারী এবং নিহত নেতা কর্মীদের পরিবারের সহায়তা), ঞ. বৃত্তি প্রদান (অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান), ট. বীজ উৎপাদন ও বিতরণ (উচ্চ মানের বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ), ঠ. সামাজিক বনায়ন প্রকল্প (পরিবেশ রক্ষার্থে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আয়োজন), ড. প্লাস্টিক সার্জারি ক্যাম্প আয়োজন (ঠোঁটকাটা, তালুকাটা এবং পোড়া রোগীদের জন্য প্লাস্টিক সার্জারি ক্যাম্প), ঢ. অ্যাজমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন (বগুড়া ও চট্টগ্রামে অ্যাজমা রোগীদের জন্য সহায়তা প্রদান), ণ. বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ (বন্যা কবলিত এলাকায় চিকিৎসা ও খাদ্য সরবরাহ) এবং ত. সহযোগিতা কর্মসূচি (সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সহযোগিতা)।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কর্মসূচির মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে একটি বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি জনাব তারেক রহমান, যিনি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের আর্থি-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন। ডা. জুবাইদা রহমান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ছানি অপারেশন ক্যাম্প পরিদর্শন।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) ২০২০ সালে কোনো মূল ধারার সশরীরে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে পারেনি, কারণ সেসময় বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী (COVID-19) চলছিল। কিন্তু সে সময় অনলাইন প্লাটফর্মে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রথম ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়, মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন ডা. মোস্তফা আজিজ সুমন এবং কনভেনার ছিলেন ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল। ডা. জুবাইদা রহমান হৃদরোগ বা কার্ডিওলজি (Cardiology) বিশেষজ্ঞ ছিলেন অনলাইন প্লাটফর্মে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রথম ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার আর্কিটেক্ট। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান-এর নির্দেশনায় এবং প্রফেসর ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার-এর সার্বিক তত্ত্বধায়নে অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয়। এই আয়োজনের মূল শিরোনাম ছিল 'ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে' (In Search of Future Scientists)। জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিন Category-তে (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে) Semifinal রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। জনাব তারেক রহমান প্রসিডেন্ট, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডা. জুবাইদা রহমান (হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারীদের সহিত Science Fair-এর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালে Covid-19'র সময় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সদস্যরা (ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং আইনজিবী) Covid-19 আক্রান্ত রোগীদের বাসায় ঔষধ সরবরাহ,

রক্তের গ্রুপ সংগ্রহ করা, হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন, রেসপিরেশন যন্ত্রাদি সরবরাহসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগের সকল শ্রেণীর মানুষকে সেবা দিয়েছে। জিয়াউর রহামন ফাউন্ডেশন ২০২২ সালে সিলেটের বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে শুকনা খাবার, সেলাইন ঔষধ সরবরাহসহ জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের চিকিৎসকরা সেবা প্রদান করেন। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) দ্বিতীয় ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় ২০২৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় ২০২৫ সালের মে মাসে।

মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন ডা. শাহ্ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ এবং কনভেনার ছিলেন প্রফেসর ড. ইউছুফ হায়দার। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) ২০২৬ সালের ৩০ আগস্ট ঘোষণা করা হয় চতুর্থ বিজ্ঞান মেলা যার শিরোনাম 'ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে-২০২৬'। এই Science Fair কর্মসূচির ঘোষণা দেন ডা. জুবাইদা রহমান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। বর্তমান বিজ্ঞান মেলার মেম্বার সেক্রেটারি ডা. মোস্তফা আজিজ সুমন এবং কনভেনার ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল। বর্তমানে প্রায় ১০০০-এর কাছাকাছি বিজ্ঞান প্রজেক্ট জমা পড়েছে। Science fair সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৮ টি বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি, বিচারক কমিটি (বিভাগীয় ও সেন্ট্রাল কমিটি), মূল কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ বছর ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞান মেলার ফাইনাল রাউন্ড ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুদের জন্য যিনি আগাম চিন্তাভাবনা করে গেছেন তার সম্পর্কে কিছু না বললে শহীদ জিয়াকে পরিপূর্ণভাবে জানা যাবে না। শহীদ জিয়া ছেলেবেলায় ছিলেন খুব লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির। তিনি কথা বলতেন কম, তবে সব কিছু খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতেন। শিশুদের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়ে আসেন শিশুপ্রিয় প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান। তিনি পথিকের ভূমিকা নিয়ে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচিসহ এগিয়ে আসেন। শহীদ জিয়া উপলব্ধি করেছিলেন দেশ ও জাতির সুদূরপ্রসারী অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিশুদের ভবিষ্যৎ সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে হবে।

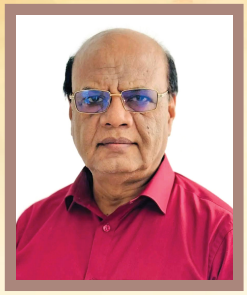
প্রেসিডেন্ট জিয়া নিজে যেমন সাদাসিধে ও সংযমী ছিলেন তেমনি তার ছেলেদেরও তিনি শিখিয়েছিলেন মিতব্যয়ী হতে, কষ্ট সহিষ্ণু হতে। শহীদ জিয়া ভালোবাসতেন শিশুদের। শিশুদের মঙ্গল কামনাই ছিল তার সব কাজের লক্ষ্য। বছরে অন্তত একটি দিন তিনি শিশুদের একান্ত সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন। এতিম শিশুদের সাথে ইফতার ও ঈদের খাবার তিনি একসাথে খেতেন। শিশুরা ওই মুহূর্তে ভুলে যেত তাদের বাবা নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই। শিশুদের কোনো অনুষ্ঠানে গেলে তিনি তাদের সাথে অল্প সময়ের মধ্যে ভাব জমিয়ে ফেলতেন যেন জিয়া শিশুদের অনেক দিনের চেনা প্রিয় বন্ধু। তিনি শিশুরা যেন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে এ কথা মনে রেখেই তিনি শিশুদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দেশের শিশুদের জন্য জিয়ার সবচেয়ে বড় উপহার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি। শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিতে তিনি জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে দেন ১৯৭৬ সালে। জিয়াউর রহমান নবীন বাংলাদেশে পথচ্যুত মানুষগুলোকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী নতুন কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। শিশু-কিশোর প্রতিভার উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'নতুন কুঁড়ি' নামে একটি সফল অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। এই অনুষ্ঠানে চারু ও কারু শিল্পের ২০টি বিভাগের ৩৫ শাখায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বহু প্রতিভাবান গুণীশিল্পী সৃষ্টি হয়েছিল! 'নতুন কুঁড়ি' ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম ট্যালেন্ট হান্ট অনুষ্ঠান।

আজ নানা দেশে নানা আদলে এই অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে। শহীদ জিয়ার আজন্ম লালিত স্বপ্ন একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ছিল তার সমগ্র জীবনের সাধনা। সেই লক্ষ্যে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে গেছেন। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র সমাজকে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো সেচ ব্যবস্থার দুর্বলতা। দেশের অসংখ্য খাল, বিল ও প্রাকৃতিক জলপথ দীর্ঘদিন অবহেলা, দখল ও পলি জমার কারণে নাব্যতা হারিয়েছে। ফলে বর্ষার পানি দ্রুত নদী হয়ে সাগরে চলে যায়, অথচ শুষ্ক মৌসুমে কৃষকরা পানির অভাবে ফসল উৎপাদনে হিমশিম খায়।

এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি গ্রহণ করে ছিলেন দূরদর্শী জিয়াউর রহমান, যার মূল লক্ষ্য ছিল বর্ষার পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। বাংলাদেশে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে নতুন শিল্প স্থাপন এবং বিদ্যমান শিল্পগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন জিয়াউর রহমান। তার আমলেই বেশ কতকগুলো টেক্সটাইল মিল ও সারকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য 'উৎসাহ বোনাস' প্রদানের রেওয়াজ চালু হয় তারই আমলে এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পাট শিল্পের শ্রমিকরা 'উৎসাহ বোনাস' লাভে সক্ষম হয়। জিয়াউর রহমানই সেই সরকারপ্রধান যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন–দেশীয় শিল্পে যা উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব, তা আমদানি করা যাবে না।

তিনি শিশু একাডেমি, শিশুপার্ক নির্মাণ ও জাতীয় শিশু-কিশোর পুরস্কার পরিবর্তন করেন! একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পদক, জাতীয় টিভি পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার সবই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদান। জিয়াউর রহমান ছিলেন ভিশনারি ম্যান, স্বপ্নদ্রষ্টা, সৎ দেশপ্রেমিক। দেশের মাটি মানুষের প্রতি তার ছিল বুকভরা ভালোবাসা। সেই মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধনকেই তিনি সংস্কৃতি মনে করতেন। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন হচ্ছে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অসমাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করার জন্য বর্তমানে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান-এর তত্ত্বাবধায়নে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন বহুমূখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার আগে বাংলাদেশকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।

লেখক : উপাচার্য, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর এবং মনিটর, সিলেট বিভাগ



শিশু ও নারী শিক্ষায় বেগম খালেদা জিয়া–জেডআরএফ-এর অনুপ্রেরণার উৎস

আমিরুল ইসলাম কাগজী



একজন মানুষের জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব কেবল তাঁর অর্জিত ক্ষমতা, রাজনৈতিক সাফল্য কিংবা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে তাঁর অবদান, অসহায়ের মুখে হাসি ফোটানোর প্রচেষ্টা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার মধ্যেই নিহিত থাকে। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্মের দিকে তাকালে জনকল্যাণের এমন বহুমাত্রিক উদ্যোগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নারী শিক্ষার প্রসার, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি, দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ে তোলা, বয়স্ক ও অসহায় মানুষের কল্যাণ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের সহায়তা, মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের মতো উদ্যোগগুলো তাঁর শাসনামলের জনকল্যাণমূলক দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

বিশেষ করে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর ভূমিকা বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। একটি শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনকেই আলোকিত করেন না, আলোকিত করেন একটি পরিবার, একটি প্রজন্ম এবং শেষ পর্যন্ত একটি সমাজকে। এই উপলব্ধি থেকেই নারী শিক্ষার প্রসারকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ক্ষুধার কারণে কোনো শিশুর শিক্ষার অধিকার যেন ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর জনকল্যাণমূলক চিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সমাজের সেই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো, যাঁরা জীবনের প্রতিকূলতায় সবচেয়ে বেশি অসহায়। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত নারী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সামাজিক সহায়তার উদ্যোগ একটি রাষ্ট্রের মানবিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। একইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। নারী ও শিশু পাচারের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধের উদ্যোগও ছিল মানবিক সমাজ বিনির্মাণের অপরিহার্য অংশ। সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়, ক্ষমতার পালাবদল ঘটে; কিন্তু মানুষের কল্যাণে নেওয়া উদ্যোগ, মানবিক মূল্যবোধ এবং জনসেবার আদর্শ কখনো হারিয়ে যায় না। বরং সেগুলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে ওঠে পথনির্দেশক। বেগম খালেদা জিয়ার জনকল্যাণমুখী চিন্তা ও উদ্যোগের উত্তরাধিকার সেই অর্থেই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের জন্য এক অনন্য পাথেয়। রাজনীতির গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিপন্ন মানুষের মুখে আশার আলো জ্বালানো এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার যে দর্শন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন তার কর্মকাণ্ডে সেই আদর্শকেই ধারণ করতে চায়। কারণ, মানুষের জন্য রাজনীতি যেমন একটি মহান দায়িত্ব, তেমনি মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাও এক অনন্য মানবিক সাধনা। বেগম খালেদা জিয়ার জনকল্যাণের সেই দর্শনই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পথচলার প্রেরণা, শক্তি ও ভবিষ্যৎ অঙ্গীকার।

খালেদা জিয়ার যে উদ্যোগ ফাউন্ডেশনের জন্য প্রেরণার উৎস

১. নারীশিক্ষার বিস্তার : বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অনুকরণীয় বিষয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে একসময় মেয়েদের শিক্ষার পথে ছিল নানা প্রতিবন্ধকতা। দারিদ্র্য, সামাজিক রক্ষণশীলতা, বাল্যবিবাহ, নিরাপত্তার অভাব এবং পরিবারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ ছিল। এই বাস্তবতায় তাঁর সরকারের সময় মেয়েদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ এবং উপবৃত্তি কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি একটি যুগান্তকারী সামাজিক উদ্যোগ হিসাবে বিবেচিত হয়। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক প্রণোদনা তৈরি হয়।

শিক্ষা অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক বিবরণে বলা হয়েছে, ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের মোট ভর্তি হার ৫৩ দশমিক ৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। জাতীয় পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই উদ্যোগের তাৎপর্য শুধু বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একজন শিক্ষিত মেয়ে ভবিষ্যতে শিক্ষিত মা হন, পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ান, সন্তানের শিক্ষায় ভূমিকা রাখেন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। অর্থাৎ একটি মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর মধ্য দিয়ে একটি পরিবারকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও সম্ভাবনার পথ তৈরি হয়। খালেদা জিয়ার সরকারের এই নীতিগত উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের নারীশিক্ষার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২. মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ : মাধ্যমিক শিক্ষার পর মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট ছিল বড় বাধা। বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। এই বাস্তবতা বিবেচনায় তাঁর সরকারের সময় মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উপবৃত্তি ও বৃত্তির ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। ২০০১-২০০৬ মেয়াদের সরকারি বক্তব্যে মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা এবং মেধাবীদের জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে মেয়েদের শিক্ষাকে কেবল পারিবারিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল না রেখে রাষ্ট্রীয় নীতির আওতায় আনার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই উদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার সুযোগ একজন নারীকে উচ্চশিক্ষা, চাকরি, উদ্যোক্তা হওয়া এবং সামাজিক নেতৃত্বে অংশগ্রহণের পথ তৈরি করে দেয়। একটি সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন শুরু হয় তাঁর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে। সেই বিবেচনায় নারীশিক্ষার প্রসারে খালেদা জিয়ার সরকারের ভূমিকা তাঁর জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান অধ্যায়।

৩. বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা : শিক্ষার অধিকারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পরিণত করা একটি দেশের উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি তৈরি হয় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত একটি শিশু ভবিষ্যতে দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ হারায়। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই নীতির মূল দর্শন ছিল শিক্ষা কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষের সম্পদ নয়; বরং প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ে যেতে না পারে, সেজন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক করার পাশাপাশি বিভিন্ন সহায়তামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরি হয়। সরকার শুধু বিদ্যালয় নির্মাণ বা শিক্ষক নিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা এবং তাদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার বিষয়টিও গুরুত্ব দিতে শুরু করে। তবে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এক বিষয় নয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার মান, শিক্ষকসংকট, অবকাঠামো ও ঝরে পড়ার মতো সমস্যাও রয়ে গেছে। এসব সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়েই এই উদ্যোগগুলোর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৪. খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা : দরিদ্র পরিবারের শিশুর পাশে রাষ্ট্র দারিদ্র্য বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম প্রধান বাধা। অনেক পরিবারে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে পরিবারের কাজে যুক্ত করা অর্থনৈতিকভাবে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই বাস্তবতায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উদ্যোগ। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানো এবং পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তায় সহায়তা করা। শিক্ষার সঙ্গে খাদ্য সহায়তার সংযোগ তৈরি হওয়ায় দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকদের কাছে বিদ্যালয়ে সন্তান পাঠানোর একটি বাড়তি প্রণোদনা সৃষ্টি হয়। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় শিক্ষা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহায়তামূলক কর্মসূচিগুলোকে একসঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিএনপির নিজস্ব রাজনৈতিক বিবরণেও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা এবং মেয়েদের উপবৃত্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা শুধু শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ক্ষুধার্ত শিশুর পক্ষে নিয়মিত পড়াশোনা করা কঠিন। তাই খাদ্য সহায়তা এবং শিক্ষার সুযোগকে একসূত্রে যুক্ত করার চিন্তা সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

৫. দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সম্প্রসারণ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনযাত্রা সবসময় অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। কোনো পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অসুস্থ হলে, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বসতবাড়ি হারালে কিংবা কোনো নারী স্বামীহারা হলে পুরো পরিবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে ওঠে। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা, মুক্তিযোদ্ধা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তাঁর সরকারের বক্তব্যে উঠে এসেছে।

এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–১. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সহায়তা সম্প্রসারণ। ২. বয়স্ক ও অসহায় মানুষের কল্যাণে কর্মসূচি। ৩. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের সহায়তা। ৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে উদ্যোগ। ৫. মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা ও কল্যাণের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া। ৬. শ্রমজীবী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বিভিন্ন সহায়তামূলক ব্যবস্থা। এসব উদ্যোগের তাৎপর্য হলো, রাষ্ট্রের উন্নয়ন কেবল জাতীয় আয় কিংবা অবকাঠামো নির্মাণ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষটি কতটা নিরাপত্তা পাচ্ছেন, সেটিও উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। তবে এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। নীতিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

৬. নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে উদ্যোগ : নারী ও শিশু পাচার বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব, প্রতারণা এবং সামাজিক অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে অপরাধী চক্র অসহায় নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সরকারি বক্তব্যে এ ধরনের অপরাধ মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া যৌতুকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সক্রিয় করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। যৌতুকের কারণে অসংখ্য নারীকে নির্যাতন, অপমান এবং কখনো প্রাণহানির শিকার হতে হয়। এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি জরুরি। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইন, প্রশাসন এবং সামাজিক মূল্যবোধ এই তিনটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় নারী ও শিশুর সুরক্ষাকে সামাজিক কল্যাণের অংশ হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়টি তাঁর জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন : প্রত্যন্ত মানুষের যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। তাই গ্রামীণ উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন পূর্ণতা পেতে পারে না। একটি গ্রামের রাস্তা ভালো

হলে কৃষক সহজে বাজারে পণ্য নিয়ে যেতে পারেন। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেতে পারে। অসুস্থ মানুষ দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছাতে পারেন। অন্যদিকে যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হলে কৃষিপণ্য নষ্ট হয়, চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হয় এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ এবং সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২০০১-২০০৬ মেয়াদের এক সরকারি ভাষণে গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট ব্যাপকভাবে নির্মাণ ও সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রভাব কেবল যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ। একজন কৃষকের উৎপাদিত ফসল বাজারে পৌঁছাতে পারা, একজন গর্ভবতী নারীর হাসপাতালে যাওয়া কিংবা একজন শিক্ষার্থীর নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি সবকিছুর সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। তাই গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নকে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

৮. নগরজীবনে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণ : নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়োনিষ্কাশন মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। বিশেষ করে ঢাকা ও অন্যান্য নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্যানিটেশন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় নগরাঞ্চলে পানি সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণের কথা সরকারি বক্তব্যে উঠে এসেছে। বিশুদ্ধ পানি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। দূষিত পানি ডায়রিয়া, আমাশয় ও বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। অন্যদিকে স্যানিটেশন সুবিধা উন্নত হলে পরিবেশ দূষণ কমে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের এই মৌলিক বিষয়গুলো অনেক সময় রাজনৈতিক আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না। অথচ একটি পরিবারের প্রতিদিনের জীবনে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

৯. শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে উদ্যোগ : একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি শ্রমজীবী মানুষ। কৃষক, শ্রমিক, পরিবহনকর্মী, সরকারি কর্মচারী–প্রত্যেকের শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্যোগ এবং পরিবহন শ্রমিকদের জন্য পৃথক কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠার কথা সরকারি ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উৎসব ভাতার বিষয়েও বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা হয়। এ ধরনের উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল কর্মজীবী মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি। বিশেষ করে পরিবহন শ্রমিকদের জীবন অত্যন্ত অনিশ্চিত। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং সীমিত সামাজিক নিরাপত্তা তাঁদের জীবনকে কঠিন করে তোলে। তাই শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠনের চিন্তাকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

১০. পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্য : পরিবেশ রক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পরিবেশ দূষণ বাড়লে মানুষের জীবনযাত্রার মান কমে যায়। বিশেষ করে বায়ুদূষণ, পলিথিনের ব্যবহার এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকারি বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলোর তাৎপর্য ছিল পরিবেশ সংরক্ষণকে রাষ্ট্রীয় নীতির আলোচনায় নিয়ে আসা। বিশেষ করে পলিথিনের অবাধ ব্যবহার বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম উভয় জায়গাতেই পরিবেশগত সমস্যা তৈরি করে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া, জলাবদ্ধতা এবং মাটির উর্বরতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো সমস্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশবান্ধব নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা ও কার্যকর প্রয়োগ জরুরি।

১১. দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা : মানুষকে দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো কর্মসংস্থান ও আয় করার সুযোগ তৈরি করা। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনার কথা বলা হয়েছিল। তাঁর সরকারের একটি ভাষণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ এবং উন্নয়নের প্রধান উপকরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই চিন্তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দর্শন রয়েছে। দরিদ্র মানুষকে শুধু আর্থিক সহায়তা দিলে সাময়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে; কিন্তু শিক্ষা, দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারলে তাঁরা নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজে পান। নারীশিক্ষার প্রসারও এই অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত। একজন শিক্ষিত নারী চাকরি করতে পারেন, উদ্যোক্তা হতে পারেন কিংবা পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারেন। সুতরাং নারীশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগগুলোকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। এগুলো একটি বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ।

১২. চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য : মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বাস্থ্যসেবা একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সুস্থ জনগোষ্ঠী। চিকিৎসার অভাবে কোনো দরিদ্র পরিবার যেন সর্বস্বান্ত না হয়, সেটি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। খালেদা জিয়ার শাসনামলে স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের বিষয়টি সামাজিক খাতের নীতিনির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সময়কালের সামাজিক খাত নিয়ে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারের অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত চিকিৎসাসেবা কিংবা তার সরকারের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে পৃথক সরকারি নথি ও পরিসংখ্যান প্রয়োজন। তাই তাঁর নামে এমন কোনো চিকিৎসা প্রকল্পের কৃতিত্ব দেওয়া সমীচীন নয়, যার যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তাঁর জনকল্যাণমূলক উত্তরাধিকার মূল্যায়নে বরং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণের সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে দেখা প্রয়োজন।

১৩. মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ : একটি মানবিক রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার সবচেয়ে অসহায় নাগরিকদের প্রতি আচরণের মধ্য দিয়ে। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন, যাঁরা বার্ধক্যের কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন কিংবা যাঁরা

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাড়তি বাধার সম্মুখীন হন–তাঁদের পাশে দাঁড়ানো রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। খালেদা জিয়ার সরকারের সময় মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা সরকারি বক্তব্যে উঠে এসেছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জনকল্যাণের ধারণা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সমাজের যাঁরা সবচেয়ে বেশি সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করাও এর অংশ।

১৪. সংসদীয় রাজনীতি ও নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা : বাংলাদেশের ইতিহাসে বেগম খালেদা জিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হলো তিনি দেশের প্রথম নির্বাচিত নারী প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত তৈরি হয়। একজন নারী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এই বাস্তবতা বাংলাদেশের সমাজে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। তাঁর নেতৃত্বের সময় নারীশিক্ষার প্রসার এবং নারীর সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের উদ্যোগগুলো এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিকভাবে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা এক বিষয় নয়। নারী নির্যাতন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো সমস্যাগুলো তখনও বিদ্যমান ছিল। তাই তাঁর অবদান মূল্যায়নে অর্জনের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতাগুলোকেও ইতিহাসের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১৫. ব্যক্তিগত জীবনের শোক থেকে জনজীবনের দায়িত্বে উত্তরণ : বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল গভীর ব্যক্তিগত শোকের মধ্য দিয়ে। ১৯৮১ সালে স্বামী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তিনি এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। ব্যক্তিগত জীবন ও সন্তানদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁকে একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়। সেখান থেকে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলা। এই যাত্রায় তিনি তিনবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন–১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে গঠিত সরকারের নেতৃত্বে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যেমন সাফল্য ছিল, তেমনি বিতর্ক, রাজনৈতিক সংঘাত ও সমালোচনাও ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করেছিলেন। ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের অবসান ঘটে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তাঁর মৃত্যুসংবাদে তাঁকে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত নারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা তুলে ধরে। মানুষের সেবায় তাঁর অবদানের সংক্ষিপ্ত তালিকা বেগম খালেদা জিয়ার জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্রগুলো এক নজরে তুলে ধরা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি জীবনের মূল্যায়ন হোক মানুষের জীবনে তার প্রভাব দিয়ে মানুষের জীবন একদিন শেষ হয়, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া কাজ, সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব অনেক সময় প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেঁচে থাকে। বেগম খালেদা জিয়ার জীবনও তেমনই একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধ্যায়। তাঁর জীবনের মূল্যায়ন করতে গেলে শুধু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা ক্ষমতার পালাবদলের ইতিহাস দেখলে চলবে না। দেখতে হবে তাঁর সময়ের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলো সাধারণ মানুষের জীবনে কী ধরনের পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি করেছিল। একটি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের যে মেয়েটি উপবৃত্তি পেয়ে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়েছিল, তার কাছে নারীশিক্ষার উদ্যোগ ছিল নতুন জীবনের দরজা। যে শিশুটি খাদ্যের সহায়তা পেয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, তার কাছে শিক্ষার সঙ্গে খাদ্যের সংযোগ ছিল বেঁচে থাকার একটি অবলম্বন। যে কৃষক একটি নতুন রাস্তা দিয়ে তাঁর উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তাঁর কাছে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ছিল জীবিকার সম্ভাবনা।

যে অসহায় নারী সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় সহায়তা পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল কঠিন সময়ে বেঁচে থাকার আশ্রয়। এভাবেই রাষ্ট্রীয় নীতি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। তবে ইতিহাসের প্রতি ন্যায়বিচার করতে হলে এটিও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রযাত্রা কোনো একজন ব্যক্তির একক অবদান নয়। বিভিন্ন সরকার, সামাজিক সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। খালেদা জিয়ার সরকারের উদ্যোগগুলো সেই বৃহত্তর ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ জনকল্যাণমূলক উত্তরাধিকারের একটি হলো মেয়েদের শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের জায়গায় নিয়ে আসা। কারণ একজন নারী শিক্ষিত হলে শুধু একজন মানুষ শিক্ষিত হন না; একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং পরবর্তী প্রজন্মের এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আজ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে নারী শিক্ষকতা করছেন, চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন, প্রশাসনে দায়িত্ব পালন করছেন, ব্যবসা পরিচালনা করছেন কিংবা সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে তুলছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সামনে যে দীর্ঘ সামাজিক পরিবর্তনের পথ তৈরি হয়েছে; তার পেছনে বিভিন্ন সময়ের নারীশিক্ষাবান্ধব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অবদান রয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়ার জীবন থেকে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়–রাষ্ট্র পরিচালনার প্রকৃত সার্থকতা কেবল ক্ষমতার আসনে নয়, মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মধ্যেই নিহিত। রাজনীতির মূল্যায়ন সময় করবে, ইতিহাস তার প্রাপ্তি ও সীমাবদ্ধতা বিচার করবে। কিন্তু শিক্ষা, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নগুলো কখনো পুরনো হয় না। একজন রাষ্ট্রনায়কের সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর পদ-পদবি নয়; মানুষের জীবনে তিনি কী পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে গেছেন, সেটিই তাঁর উত্তরাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ জীবনের জনকল্যাণমূলক অধ্যায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এই সত্যটি প্রাসঙ্গিক।

লেখক : সাংবাদিক ও গবেষক



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন যে কাজটি করতে পারে

ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন আহমেদ অসীম



আমার স্ত্রীসহ লেখাপড়ার সুবাদে বেশ কিছুটা সময় বিলেতে কেটেছে। আমাদের দুই সন্তান গ্রেড ফোর থেকে সেখানকার স্কুল জীবন শুরু করে। বিভিন্ন সময়ে অভিভাবক হিসাবে স্কুল শিক্ষকদের কাছ থেকে চিঠি বা ই-মেইল পেতাম, 'তোমাদের বাচ্চাকে ১ পাউন্ড বা সামর্থ্য অনুযায়ী অমুক তারিখে অমুক দিবস উপলক্ষে সঙ্গে দেবে।' তখন থেকেই বুঝতে পারলাম কেন এই দানের বিষয়টি শিশুর জীবনে এতো গুরুত্বপূর্ণ। মূল বিষয়টা ছিল, ছোটবেলা থেকেই কোমলমতি শিশুদের মাঝে দান করা বা দাতব্য কাজে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, বিশেষভাবে শিশুদের মাঝে ছোটবেলা থেকে এই মহৎ কর্মটিতে উৎসাহিত করার প্রবণতা তৈরি করা।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিশুদের মধ্যে চ্যারিটি বা পরোপকারের মানসিকতা গড়ে তোলা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মানবিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতা শক্তিশালী হবে। এ ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (ZRF) একটি রাজনীতিনিরপেক্ষ মানবিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ হিসাবে কাজ করলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সম্ভাব্য ভূমিকা

১. 'শিশুর ছোট্ট দান, বড় মানবতা' কর্মসূচি : প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য ছোট পরিসরে Charity Box স্থাপন করা যেতে পারে। শিশু তার সামর্থ্য অনুযায়ী ১/২/৫/১০ টাকা বা অন্য কোনো উপায়ে অবদান রাখবে। মূল লক্ষ্য হবে টাকার পরিমাণ নয়, দেওয়ার অভ্যাস তৈরি করা।

২. মাসিক 'এক শিশুর এক ভালো কাজ' : প্রতি মাসে প্রত্যেক শিশুকে অন্তত একটি ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করা। যেমন : ক. অসচ্ছল সহপাঠীকে বই দেওয়া, খ. গাছ লাগানো, গ. বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা, ঘ. পথশিশুকে খাবার দেওয়া এবং ঙ. স্কুলের পরিচ্ছন্নতায় অংশ নেওয়া।

৩. 'Charity is Caring' শিশু-ক্লাব নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ZRF-এর সহযোগিতায় Junior Charity Club গঠন করা যেতে পারে। শিক্ষকরা তত্ত্বাবধান করবেন এবং শিশুরাই ছোট ছোট সামাজিক উদ্যোগ পরিচালনা করবে।

৪. Charity Song ও গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা : শিশুদের জন্য সহজ ভাষায় গান, গল্প, কার্টুন ও অ্যানিমেশন তৈরি করা যেতে পারে। সেখানে শেখানো হবে 'আমি একা ভালো থাকবো না, অন্যকেও ভালো রাখবো।'

৫. Birthday Charity শিশুদের জন্মদিনে উপহার নেওয়ার পরিবর্তে একটি বই, গাছের চারা, খাবার বা ছোট অনুদান দিয়ে অন্যকে সাহায্য করার সংস্কৃতি তৈরি করা যেতে পারে।

৬. 'একটি শিশু একটি বই' উদ্যোগ : একজন শিশু বছরে অন্তত একটি ভালো বই অন্য কোনো শিশুকে উপহার দেবে। এভাবে Charity-কে শুধু অর্থদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে Knowledge Charity-তে পরিণত করা যায়।

৭. স্কুলভিত্তিক ছোট Charity Project : প্রতি বিদ্যালয়ে বছরে একটি করে প্রকল্প করা যেতে পারে। যথা : ক. দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ, খ. শীতবস্ত্র বিতরণ, গ. বই ব্যাংক, ঘ. School Meal Support এবং ঙ. প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়তা করা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশু শুধু দাতা হবে না; সে যেন পরিকল্পনা, সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়।

৮. শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা : ZRF একটি 'Charity Education Guide for Primary Schools' তৈরি করতে পারে। সেখানে শিক্ষক ও অভিভাবকদের বোঝানো হবে যে Charity মানে শুধু টাকা দেওয়া নয়; বরং সময়, শ্রম, জ্ঞান, ভালোবাসা ও সহমর্মিতাও charity.

৯. স্বচ্ছতার বিশেষ ব্যবস্থা : শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ কোথায় ব্যয় করা হয়েছে তা স্কুলের নোটিশ বোর্ড বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা উচিত। যেমন :

Collected : Tk. 12,500
Spent for : 5 disadvantaged students' school supplies
Balance : Tk. 500

এতে ছোটবেলা থেকেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি হবে।

১০. জাতীয় পর্যায়ে 'Young Humanitarian Award' : প্রতি বছর এমন শিশু বা স্কুলকে সম্মাননা দেওয়া যেতে পারে যারা উল্লেখযোগ্য মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে। পুরস্কারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে তাদের কাজের গল্প অন্য শিশুদের সামনে তুলে ধরা। একটি সম্ভাব্য ZRF মডেল 'ZRF Young Humanitarian Programme'.

Learn → Give → Serve → Share
Learn : পরোপকার ও মানবিকতার শিক্ষা।
↓
Give : সামর্থ্য অনুযায়ী দান।
↓
Serve : সমাজের জন্য কাজ।
↓
Share : অন্যদেরও ভালো কাজে উৎসাহিত করা।

এটি যদি ১০০টি স্কুল দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে সারাদেশে সম্প্রসারণ করা যায়, তাহলে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক মূল্যবোধ তৈরির কর্মসূচি হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি হওয়া উচিত, 'শিশুকে দান করতে শেখানোর আগে, অন্যের কষ্ট অনুভব করতে শেখাতে হবে।' অর্থাৎ ZRF-এর লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুর হাতে শুধু Charity Box তুলে দেওয়া নয়; তার হৃদয়ে সহমর্মিতার সংস্কৃতি তৈরি করা। মনে রাখতে হবে, আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ; তবে মানবিক গুণাবলী অর্জনে আমরা যদি কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করি।

লেখক : প্রখ্যাত আইনজীবী



শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গ্রামীণ উন্নয়ন চিন্তা ও স্বনির্ভর সমাজ গঠনের প্রত্যয়

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান



বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হলো এর গ্রামগুলো। স্বাধীনতার পর পরই জাতীয় পুনর্গঠনের বাস্তবতায় গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন সময়ে দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবিকা ও সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে কৃষি খাতটি গভীর কাঠামোগত সঙ্কটে ছিল; আধুনিক সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা, কৃষিপণ্যের ন্যায্য বাজারের অভাব এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মৌসুমী বেকারত্ব গ্রামীণ জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছিল। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ছিল সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই সঙ্কটময় বাস্তবতায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন চিন্তায় গ্রামীণ অর্থনীতি পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তাঁর গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মূল দিক ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে সক্রিয় করা।

১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচিতে এই চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। সেখানে কৃষির উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁর শাসনামলে গ্রামীণ অবকাঠামো ও কৃষি খাতের উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগগুলোর মধ্যে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খাল খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুযোগ বাড়ানো এবং বর্ষা মৌসুমে পানির ব্যবস্থাপনা উন্নত করার চেষ্টা করা হয়। এসব উদ্যোগের পেছনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানব সম্পদ ও স্থানীয় সম্পদকে সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা।

সমকালীন গবেষণাতেও খাল খনন কর্মসূচিকে কৃষি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি উন্নয়ন উদ্যোগ হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে জিয়াউর রহমানের গ্রামীণ উন্নয়নচিন্তাকে কেবল কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর একটি কারিগরি বা অর্থনৈতিক উদ্যোগ হিসাবে দেখলে এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কৃষির সঙ্গে গ্রামীণ শ্রমশক্তি, সামাজিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং মানুষের আত্মমর্যাদার সম্পর্ক রয়েছে। একটি গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি যখন সচল হয়, তখন তার প্রভাব সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে পড়ে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'স্বনির্ভর সমাজ' বা 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ'-এর ধারণাটি তাঁর উন্নয়ননীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে জিয়াউর রহমানের গ্রামীণ উন্নয়নচিন্তাকে একটি ধারাবাহিক ও বস্তুনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হবে। তৎকালীন গ্রামীণ বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক সঙ্কট পর্যালোচনা করা হবে। আলোচনার মূল লক্ষ্য কোনো রাজনৈতিক মূল্যায়ন নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ের গ্রামীণ উন্নয়নচিন্তা অনুধাবন করা।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের অর্থনীতি গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো, দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার স্থবিরতা গ্রামীণ জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ মূলত জীবন-জীবিকার জন্য প্রথাগত কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু প্রথাগত সেচ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং আধুনিক উপকরণের অভাবে কৃষি উৎপাদন জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে থেকে যায়।

গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম জটিল সমস্যা ছিল ছদ্ম বেকারত্ব এবং মৌসুমী বেকারত্ব। কৃষির মৌসুমী প্রকৃতির কারণে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকদের হাতে পর্যাপ্ত কাজ থাকতো না। প্রথাগত কৃষিখাত এই বিপুল শ্রমশক্তিকে সারা বছর কাজে যুক্ত করতে পারতো না। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কমানো কঠিন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কেবল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নয়; বরং গ্রামীণ মানুষকে বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

অপরদিকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতায় পানি ব্যবস্থাপনা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অজস্র নদী-নালা ও খালের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে শুষ্ক মৌসুমে অনেক জমি অনাবাদি থাকতো। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি ও জলাবদ্ধতার কারণে ফসলের ক্ষতি হতো। ১৯৮৪ সালের একটি গবেষণায় শুষ্ক মৌসুমের পানি সঙ্কট ও বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত পানিকে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। জিয়াউর রহমানের উন্নয়নচিন্তায় এই বাস্তবতার

প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে অধিকতর স্বনির্ভর করা।

তৎকালীন সময়ে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা এবং সীমিত অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে নিজস্ব সম্পদ ও শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমানের নীতিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষিঋণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনায় সেচ, উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কৃষিঋণ এবং কৃষি সম্প্রসারণের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময় উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। উন্নয়নকে শুধু সরকারি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না রেখে স্থানীয় জনগণকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি ছিল এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই কর্মসূচিতে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের বিষয়ও যুক্ত ছিল।

সংক্ষেপে বলা যায়, খাদ্য সঙ্কট, সেচ সমস্যা, কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদের বাস্তবতা–এই কয়েকটি চ্যালেঞ্জ থেকেই জিয়াউর রহমানের গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার চিন্তা বিকশিত হয়। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি পুনর্গঠনে কৃষিখাতকে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে 'খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণকরণ' এর লক্ষ্য সামনে রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা এবং খাদ্য ঘাটতি কমানো। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান ছিল সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। খাল খনন ও পুনঃখননের পাশাপাশি নলকূপ, পাম্প এবং অন্যান্য সেচ উপকরণ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। একইসঙ্গে কৃষকদের কাছে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও কৃষিঋণ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় আসে।

কৃষি উৎপাদনের সুফল নিশ্চিত করতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। উৎপাদিত ফসল সময়মতো বাজারে পৌঁছাতে না পারলে কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এই বাস্তবতায় গ্রামীণ রাস্তাঘাট, হাটবাজার এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন কৃষি ও স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে। গ্রামীণ যোগাযোগের উন্নয়ন কৃষিপণ্য পরিবহনের পাশাপাশি অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগও বাড়াতে পারে। অবকাঠামোগত এই পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বহুমুখীকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় বাজারে লেনদেন বাড়ে এবং এর সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন ও কৃষিভিত্তিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটতে পারে। এই পুরো ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল উৎপাদনমুখী কাজের সঙ্গে মানবসম্পদের সংযোগ ঘটানো। খাল খনন ও অবকাঠামো নির্মাণে গ্রামীণ শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে কৃষি, সেচ, অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। যে কোনো টেকসই উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো জনগণের অংশগ্রহণ।

জিয়াউর রহমানের গ্রামীণ উন্নয়ন নীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণকে যুক্ত করার চেষ্টা। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাল খনন কর্মসূচি কেবল একটি প্রকৌশলগত উদ্যোগ ছিল না; এর সঙ্গে স্থানীয় শ্রম ও অংশগ্রহণও যুক্ত ছিল। মানুষ যখন নিজের এলাকার খাল খনন, রাস্তা নির্মাণ বা অন্য কোনো উন্নয়নকাজে অংশ নেয়, তখন উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হয়। এতে স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্ববোধ ও অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের ব্যবহার এই চিন্তার অন্যতম দিক ছিল। প্রতিটি গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব সমস্যা, জমির ধরন এবং শ্রমের সুযোগ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখে। এই স্থানীয় জ্ঞান ও সম্পদকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা গ্রামীণ উন্নয়নকে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করার একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই জনসম্পৃক্ততাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে স্বনির্ভর বাংলাদেশ আন্দোলন এবং গ্রাম সরকারসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করার বিষয়টি সমকালীন গবেষণায়ও আলোচিত হয়েছে। এসব উদ্যোগের বাস্তবায়ন, কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন একাডেমিক মত রয়েছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সঙ্গে স্থানীয় শ্রম, জ্ঞান ও উদ্যোগকে যুক্ত করাই ছিল এই জনসম্পৃক্ততা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

জিয়াউর রহমানের উন্নয়নচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল 'স্বনির্ভর সমাজ' গঠন। স্বনির্ভরতা শুধু অর্থনৈতিক পরিমাপ বা পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, জনগণের অংশগ্রহণ এবং নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ও যুক্ত। 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' ধারণার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সক্রিয় অংশীদার করার চেষ্টা দেখা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বনির্ভরতা মানে বাইরের সহায়তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব উৎপাদন ও সম্পদের ব্যবহার বাড়ানো। যখন একটি পরিবার বা গ্রাম নিজের প্রয়োজনের একটি অংশ নিজে উৎপাদন করতে পারে এবং অতিরিক্ত উৎপাদন বাজারে বিক্রি করতে পারে, তখন তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে উৎপাদন ও লেনদেন বাড়লে স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বনির্ভরতার একটি সামাজিক দিক হলো মানুষের নিজস্ব শ্রম ও সক্ষমতার মূল্যায়ন। মানুষ যখন নিজের শ্রমের মাধ্যমে স্থানীয় কোনো সমস্যা সমাধানে অংশ নেয়, তখন তার মধ্যে দায়িত্ববোধ ও অংশীদারিত্বের অনুভূতি তৈরি হতে পারে। এই অর্থে স্বনির্ভরতা কেবল অর্থনৈতিক ধারণা নয়; এটি সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গেও সম্পর্কিত। তবে স্বনির্ভরতার অর্থ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বা রাষ্ট্রীয় সহায়তা অস্বীকার করা নয়। বরং সরকার ও

স্থানীয় সমাজের মধ্যে একটি কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠাই এর বাস্তব অর্থ হতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও বৃহৎ অবকাঠামোতে সরকারি সহায়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে স্বনির্ভরতা একটি অংশগ্রহণমূলক সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথাগত কৃষির পাশাপাশি আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি, যান্ত্রিকীকরণ এবং বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার ঘটেছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, পানি ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসংস্থানের মতো কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন এখনও গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ননীতিতেও কৃষি, অবকাঠামো, জীবিকা ও জলবায়ু সহনশীলতার সমন্বিত গুরুত্ব দেখা যায়। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অবকাঠামো নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, আকস্মিক বন্যা, খরা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পানি ব্যবস্থাপনা, জলাশয় সংরক্ষণ, খাল পুনঃখনন এবং উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতেও খাল পুনঃখনন, সেচ সুবিধা এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আজকের গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্য কেবল জমিতে খাদ্য উৎপাদন নয়; কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ এবং মূল্য সংযোজনও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকের উৎপাদন যদি কার্যকর বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরণের সুযোগ বাড়ে। একইসঙ্গে গ্রামীণ যুবসমাজকে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করা বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গ্রাম থেকে শহর বা বিদেশে অভিবাসনের প্রবণতা কমাতে গ্রামীণ অকৃষি খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, কারিগরি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণও গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংক মূল্যায়নেও যুব ও নারীদের জন্য কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনশীল সুযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অতএব, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো গ্রামীণ জনগণকে কেবল সুবিধাভোগী হিসাবে না দেখে উন্নয়নের সক্রিয় অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা হলে স্থানীয় সক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়।

সামাজিক সেবা বা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মানুষকে নিজের সক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কেবল সরকারি সহায়তা বা ভাতা প্রদান দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য কমানোর একমাত্র উপায় নয়; এর সঙ্গে শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীল সম্পদে প্রবেশাধিকারও প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি স্বনির্ভর সমাজের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষা, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ তৈরি করে একজন গ্রামীণ তরুণকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

কৃষিখাতেও কৃষকদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, আবহাওয়ার তথ্য, বাজার তথ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব হওয়া উচিত মানুষের নিজস্ব অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। সহায়তার ধরন এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে তা স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। সাহায্য গ্রহীতার নিষ্ক্রিয় ভূমিকার পরিবর্তে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ধারণার সঙ্গেই স্বনির্ভর সমাজচিন্তার একটি সম্পর্ক তৈরি হয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গ্রামীণ উন্নয়নচিন্তা ছিল তৎকালীন সঙ্কট মোকাবেলা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধির একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। তাঁর গৃহীত নীতিমালায় কৃষি উৎপাদন, পানি ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ অবকাঠামো এবং মানবসম্পদ ব্যবহারের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। একইসঙ্গে উন্নয়ন কার্যক্রমে সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং, তাঁর গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশলকে শুধু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি হিসাবে দেখলে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দিক বাদ পড়ে। এর সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের অংশগ্রহণ, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, কর্মসংস্থান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণাও যুক্ত ছিল। স্বনির্ভরতার মূল ভাবনায় ছিল নিজস্ব শ্রম, সম্পদ ও উদ্যোগকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির রূপ অনেক বদলেছে। তবু উন্নয়নে মানুষের অংশগ্রহণ, স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীল সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এখনও গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের অভিজ্ঞতাকে সরাসরি অনুকরণ না করে তার প্রাসঙ্গিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হলে বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার আলোচনায় তা একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগতে পারে।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়



ভয়ঙ্কর সেই সব রাতের কথা স্মরণ করে এখনও শিউরে উঠি

অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ



প্রায় আড়াই হাজার অস্ত্রোপচার, সংখ্যাটি শুনতে হয়তো সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি অস্ত্রোপচারের পেছনে রয়েছে একেকটি জীবনসংগ্রাম, অসংখ্য নির্ঘুম রাত, স্বজনদের উৎকণ্ঠা এবং মানুষের প্রতি মানুষের অপরিসীম ভালোবাসার গল্প। রয়েছে এমন এক দুঃসময়ের স্মৃতি, যখন একজন আহত মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করাও ছিল সাহস ও মানবিক দায়িত্ববোধের কঠিন পরীক্ষা।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে গর্বে বুক ভরে ওঠে, আবার বেদনায় মন ভারী হয়ে আসে। গর্ব হয়, কারণ ভয় ও প্রতিকূলতার মধ্যেও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছিলাম। কষ্ট হয়, কারণ চিকিৎসার মতো একটি মানবিক দায়িত্ব পালন করতেও দিনের পর দিন গোপনে কাজ করতে হয়েছে, রাতের অন্ধকারে হাসপাতালের দরজা খুঁজতে হয়েছে। আহত মানুষটিকে কোথায় নেওয়া নিরাপদ, কোন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব–এসব নিয়েও প্রতিনিয়ত ভাবতে হয়েছে।

আজ পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাদের একটাই প্রত্যাশা–মানুষের সেবা করতে গিয়ে যেন আর কাউকে এমন অন্ধকার সময়ের মুখোমুখি হতে না হয়।

মানুষের সেবার প্রত্যয়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সঙ্গে

২০০২ সাল থেকে আমি জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত। ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানের দূরদর্শী চিন্তা ছিল, রাজনীতি কেবল মিছিল-মিটিং কিংবা বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; মানুষের দুঃখ-কষ্টে পাশে দাঁড়ানোও হতে হবে রাজনীতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই জনগণের কল্যাণে কাজ করার একটি মানবিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গড়ে ওঠে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন।

ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানের পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যুক্ত হন তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ফাউন্ডেশন বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান, জটিল অস্ত্রোপচার এবং বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তবে রাজনৈতিক সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার আহত নেতাকর্মীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা ছিল আমাদের অন্যতম কঠিন দায়িত্ব।

রাজপথের আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। পুলিশের ছোঁড়া রাবার বুলেট ও স্প্লিন্টারের আঘাতে কারও হাত-পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারও চোখে বিদ্ধ হয়েছে ধাতব টুকরো। কেউ পড়েছেন স্থায়ী পঙ্গুত্বের ঝুঁকিতে। শারীরিক ক্ষতের পাশাপাশি তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে ভয়, অনিশ্চয়তা ও অসহায়ত্বের।

রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে অনেকের চিকিৎসা পাওয়ার পথ কঠিন হয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের সামনে দুটি পথ ছিল–ভয়ে পিছিয়ে যাওয়া, অথবা মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিলাম।

রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি : মানবিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার

আহত নেতাকর্মীদের চিকিৎসা সমন্বয় ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গঠন করা হয় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি। আমি অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ এই কমিটির আহ্বায়ক এবং ডা. পারভেজ রেজা কাকন সদস্যসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করি।

আমাদের উদ্যোগে এ পর্যন্ত আড়াই হাজারেরও বেশি আহত রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, যার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেওয়া হয়নি। এই মানবিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করেছেন অসংখ্য চিকিৎসক। তাদের মধ্যে রয়েছেন অর্থোপেডিক সার্জন অধ্যাপক ডা. সিরাজুস সালেহীন, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির, নিউরোসার্জন অধ্যাপক ডা. মাইনুল হক সরকার, ডা. রবার্ট, ডা. পারভেজ রেজা কাকন, অধ্যাপক ডা. সাইফুদ্দিন, ডা. মীর রাশেক আলম অভি, ডা. এসএম পারভেজ আহমেদ (সোহেল), মরহুম ডা. সাজেদুর রেজা ফারুকী, ডা. এম আর হাসান, ডা. শাওন বিন রহমান, ডা. সাজিদ ইমতিয়াজ, ডা. রাকিবুজ্জামান, ডা. কামরুজ্জামান, ডা. মোস্তফা আওলাদ শাফি, ডা. আনারুল ইসলাম, ডা. আয়াজ ও ডা. জাহিদসহ আরও অনেকে।

এ ছাড়া সারা দেশে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর অসংখ্য চিকিৎসক এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রত্যেকের অবদান আমাদের কাছে অমূল্য। সবার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

রাতের অন্ধকারে চিকিৎসার লড়াই

শুরুর দিকে কলাবাগানের একটি হাসপাতালে আমরা অস্ত্রোপচার করতাম। ধানমন্ডি ৩২-এর কাছাকাছি হওয়ায় ওই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা ছিল বেশি। ফলে সব সময় এক ধরনের আশঙ্কা কাজ করত–কখন কী ঘটে যায়!

গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাওয়ার ভয়ই আমাদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ছিল না। বরং বেশি ভাবাত একটি প্রশ্ন–আমরা গ্রেপ্তার হলে আহত মানুষগুলোর চিকিৎসার দায়িত্ব কে নেবে?

পরিস্থিতির কারণে পরে শ্যামলীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার শুরু করি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মানবিক বিবেচনায় আমাদের সহযোগিতা করতে রাজি হলেও একটি শর্ত ছিল–অন্য রোগীর চাপ কম থাকলেই কেবল অস্ত্রোপচার করা যাবে। ফলে কখনো গভীর রাতে, কখনো ভোরের আলো ফোটার আগে চলত চিকিৎসা কার্যক্রম।

হাসপাতালে প্রবেশ করতে হতো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। আমাদের অনেকেই তখন সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। ধরা পড়লে মামলা, বিভাগীয় তদন্ত কিংবা শাস্তিমূলক বদলির আশঙ্কা ছিল। তারপরও আহত মানুষের মুখ মনে পড়লে পিছিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারতাম না।

ডা. এম আর হাসান : দূরত্ব পেরিয়ে ছুটে আসা এক সহযোদ্ধা

এই দীর্ঘ পথচলায় জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক ডা. এম আর হাসানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই। আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত, আর তার পোস্টিং ছিল খুলনার প্রত্যন্ত কয়রা উপজেলায়।

ঢাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে মানুষের আহত হওয়ার খবর পেলেই তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। প্রায়ই ফোন করে বলতেন, "ভাই, আমি আসব?"

আমি বুঝতাম, এটি কেবল ঢাকায় আসার অনুমতি চাওয়া নয়; বরং মানুষের বিপদের সময় পাশে দাঁড়াতে না পারার গভীর অস্থিরতা। চাকরির দায়িত্ব, সম্ভাব্য শোকজ কিংবা চাকরি হারানোর আশঙ্কা কোনো কিছুই তাকে সহজে থামাতে পারেনি।

আহতদের শরীর থেকে ধাতব টুকরো বের করার পর সেগুলোও গোপনে সরিয়ে নিতে হয়েছে আমাদের। প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হয়েছে। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই–আহত মানুষটির চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ পরিচয় গোপন রেখে করতে হয়েছে। এরপর প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। সময় বদলেছে, কিন্তু সেই দিনগুলোর স্মৃতি আজও গভীরভাবে মনে গেঁথে আছে।

হাসপাতালের দরজা বন্ধ হলে শুরু হতো নতুন সংগ্রাম

সারা দেশ থেকে আহত মানুষ আমাদের কাছে আসতেন। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে মামলা ছিল, কারও নাম ছিল আসামির তালিকায়। নানা বাধা অতিক্রম করে তাদের ঢাকায় নিয়ে আসা এবং নিরাপদে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ।

কোনো রোগীর জরুরি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, কোথায় তাকে ভর্তি করা যাবে, কী ধরনের চিকিৎসা ও সহায়তা লাগবে–সবকিছু সমন্বয় করতে হতো আমাদের। বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা আহতদের তথ্য জানাতেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো।

সব চেষ্টা করেও অনেক সময় হাসপাতালে জায়গা পাওয়া যেত না। হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল আহতদের চিকিৎসা দিতে রাজি হয়েছিল। কোনো কোনো রাতে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রোগী নিয়ে ছুটতে হয়েছে। এমনও হয়েছে, রাত দুইটার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভয় দেখানোর কারণে আহত রোগীকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তখন সিএনজিতে করে এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ছুটতে হয়েছে আমাদের।

একজন গুলিবিদ্ধ মানুষের জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন, অথচ তাকে নিয়ে হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে–এই অসহায়ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। চিকিৎসার মতো মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।

যারা ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন কিংবা নীরবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তাদের সহায়তা ছাড়া এত মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হতো না।

নির্ঘুম রাত, রমজান মাস ও দায়িত্বের টান

রমজান মাসে কখনো অস্ত্রোপচার শেষ করতে করতে সাহরির সময় হয়ে যেত। সাহরি খেয়ে আমাকে ছুটতে হতো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে, আর অন্য সহকর্মীরা ফিরে যেতেন নিজ নিজ কর্মস্থলে। শরীর ক্লান্ত থাকত, চোখে ঘুম জমত; কিন্তু মনে হতো, একজন আহত মানুষের চিকিৎসা বাকি থাকতে আমাদের বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ কোথায়?

অনেক রাত কেটেছে কেবল একটি অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে। কখনো সফল হয়েছি, কখনো হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। কিন্তু পরদিন আবার নতুন করে চেষ্টা করেছি। কারণ, আমাদের কাছে প্রতিটি আহত মানুষ ছিলেন একটি জীবন, একটি পরিবার এবং অসংখ্য স্বপ্নের প্রতীক।

এই কাজের বিনিময়ে আমরা কোনো অর্থ চাইনি। আহত মানুষগুলো আবার হাঁটতে পারছেন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন কিংবা পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন–এমন খবরই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

আড়াই হাজার অস্ত্রোপচারের পেছনে মানুষের ভালোবাসা

আজ প্রায় আড়াই হাজার অস্ত্রোপচারের কথা বলতে গিয়ে আমি শুধু সংখ্যার হিসাব করি না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আহত মানুষগুলোর চেহারা, উদ্বিগ্ন স্বজনদের অপেক্ষা, চিকিৎসকদের সাহস এবং কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মানবিক ভূমিকা।

এই অর্জন কোনো একজন মানুষের নয়। এটি চিকিৎসক, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্যকর্মী, সংগঠক এবং নীরবে সহযোগিতা করা অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। নির্যাতনের শিকার হয়েও যারা বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে গেছেন, তাদের সাহস ও সংগ্রামের প্রতিও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

এই দীর্ঘ পথচলা আমাদের শিখিয়েছে, চিকিৎসা কেবল একটি পেশা নয়; এটি মানুষের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা। একজন চিকিৎসকের কাছে রোগীর রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে বড় হওয়া উচিত তার জীবন, যন্ত্রণা এবং সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার।

আমরা চাই, কোনো চিকিৎসককে যেন রোগীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভয়ের মধ্যে থাকতে না হয়। রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে কোনো আহত মানুষকে যেন হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরতে না হয়। জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে কোনো পরিবারকে যেন অসহায় হয়ে পড়তে না হয়।

চিকিৎসাসেবা হবে মানবিক, নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো হবে চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব, আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে রাষ্ট্র ও সমাজের কর্তব্য।

আর যেন ফিরে না আসে এমন নিকষ কালো রাত

অতীতের সেই দিনগুলো আমাদের গর্বের, আবার গভীর বেদনারও। গর্বের, কারণ ভয় ও প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। বেদনার, কারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর মতো মহৎ কাজেও আমাদের গোপনীয়তা, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

আমরা চাই, সেই দিনগুলোর স্মৃতি ইতিহাসে মানবিক সাহস, ত্যাগ ও দায়িত্ববোধের উদাহরণ হয়ে থাকুক। কিন্তু বাস্তব জীবনে সেই অন্ধকার যেন আর কখনো ফিরে না আসে।

মানুষের সেবায় আমাদের পথচলা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। কারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে বড় দায়িত্ব নেই, আর একটি জীবন বাঁচানোর চেয়ে বড় প্রাপ্তিও নেই।

আমাদের একটাই প্রত্যাশা–আর যেন ফিরে না আসে এমন নিকষ কালো রাত।

লেখক: অর্থোপেডিক সার্জন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংযুক্ত



কমল বীজ : ভালো বীজ সম্প্রসারণে জেডআরএফ-এর একটি উদ্যোগ

ড. খন্দকার মাহফুজুল হক



বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্য অর্জনে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার অপরিহার্য। কৃষির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলোর মধ্যে বীজ অন্যতম। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে বীজের মোট চাহিদা প্রায় ১২,০৯,০৫০ মেট্রিক টন (বারো লক্ষ নয় হাজার পঞ্চাশ মেট্রিক টন)। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা মিলিয়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৩,৩৭,২৫০ মেট্রিক টন (তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন), যা মোট চাহিদার প্রায় উনত্রিশ শতাংশ। অবশিষ্ট প্রায় একাত্তর শতাংশ চাহিদা কৃষকের নিজস্ব উৎস থেকে সংগৃহীত বীজ দিয়ে পূরণ করা হয়। তবে এসব বীজের মান যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না বলে এগুলোর গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বীজের চাহিদা ও সরবরাহের এই বড় ব্যবধান কেবল সরকারি সংস্থার মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। সরকারি পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল এবং ভর্তুকিনির্ভর হওয়ায় এ ক্ষেত্রে বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমল বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম

দেশের বীজ উৎপাদনের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নির্দেশনায় এবং নির্বাহী পরিচালক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে 'কমল বীজ' কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও ভালুকায় ৩০ একর জমিতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ব্রি ধান-২৮ ও ব্রি ধান-২৯ জাতের বীজ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরে তা কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী, ঢাকার সাভার এবং মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে সম্প্রসারিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত বীজ ফাউন্ডেশন কোনো মুনাফা ছাড়াই ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে থাকে। বৈরী পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতার কারণে বিগত বছরগুলোতে ফাউন্ডেশনের বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম বন্ধ ছিল। জুলাই বিপ্লবের পর স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, ২০২৪ সালের আমন মৌসুমে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের চক নজু গ্রামে প্রায় ১২ একর জমিতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতে প্রায় ১৫ হাজার কেজি বীজ উৎপাদিত হয়। চুক্তিবদ্ধ চাষিদের কাছ থেকে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে বীজ ক্রয় করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়। যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বস্তাবন্দির পর এসব বীজ কিশোরগঞ্জ ও রাজবাড়ী জেলার কৃষকদের কাছে কোনো মুনাফা ছাড়াই ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমন মৌসুমে কাপাসিয়ার টোক ইউনিয়ন ও মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় ব্রি ধান ১০৩ জাতের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের পাশাপাশি জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন চুক্তিবদ্ধ চাষি ও প্রতিবেশী কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের নিজ উদ্যোগে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে দক্ষ করে তোলা, যাতে তাঁরা নিজেদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারেও বীজ সরবরাহ করতে পারেন। এ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত প্রায় ১,০০০ কৃষককে বিনামূল্যে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক অর্জিত জ্ঞান নিজস্ব চাষাবাদে প্রয়োগ করতে এবং অন্য কৃষকের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারেন। ফলে এ উদ্যোগের তাৎপর্য শুধু বীজ সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; কৃষকের দক্ষতা ও নিজ উদ্যোগে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের সামর্থ্য বৃদ্ধির সঙ্গেও যুক্ত হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিএনপির চেয়ারম্যান এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার ২৭ নম্বর দফায় কৃষকের উৎপাদন ও বিপণন সুরক্ষা এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দফার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতে ধানবীজের পাশাপাশি অন্যান্য দানাজাতীয় ও সবজি ফসলের বীজ উৎপাদন এবং নিজস্ব বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে বীজ ক্রয়-বিক্রয় সহজতর করতে একটি ডিজিটাল অ্যাপভিত্তিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। এই প্ল্যাটফর্মে বীজ উৎপাদনকারী চাষিদের উৎপাদিত বীজের জাত, পরিমাণ, গুণাগুণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের পাশাপাশি বীজ ক্রয়কারী ব্যবসায়ী, কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর সংরক্ষিত থাকবে। ক্রেতা ও বিক্রেতার তথ্য যাচাই-বাছাই এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ে সহায়তার জন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিনিধি প্ল্যাটফর্মের অ্যাডমিন ও ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন ও বিপণন সম্প্রসারণ, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নির্ভরযোগ্য সংযোগ স্থাপন এবং বীজ উৎপাদনকারী চাষিদের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

ক্ষুধামুক্ত, সুস্থ ও সবল জনগোষ্ঠীই একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার মূল শক্তি। এ লক্ষ্য সামনে রেখে গণমানুষের নেতা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান বিদেশে অবস্থানকালেও তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে 'কমল বীজ' প্রকল্পসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম চালু রেখেছিলেন। স্বল্প পরিসরে হলেও এসব উদ্যোগের সুফল পাচ্ছে দেশের সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী।

লেখক : কৃষিবিদ



একটি উদ্যোগ, একটু চেষ্টা, এনে দিবে সচ্ছলতা, দেশে আসবে স্বনির্ভরতা

অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন



টেকসই এবং সমৃদ্ধ এক আগামীর স্বপ্ন নিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের যেমন যাত্রা শুরু হয়েছিল ঠিক একই স্বপ্ন নিয়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পথচলা। স্বনির্ভরতার দর্শন আর মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। সংগঠনের প্রাণপুরুষ জনাব তারেক রহমান দেশগঠনের মৌলিক একটি উপায় যখন বাৎলে দিলেন ঠিক তখনই ঘটে গেল অভূতপূর্ব এক ঘটনা, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পেল। আদর্শ যখন আর্তমানবতার সেবা তখন একইসঙ্গে সেবার ধরন এবং ধারণাকে ছড়িয়ে দেয়াও যে যায়, তা-ই সামনে চলে এলো। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) একদিকে যেমন হয়ে উঠল মানব সেবায় কান্ডারি এক সংগঠন, অন্যদিকে পথপ্রদর্শক হলো অন্যান্য সেবামূলক সংগঠনেরও। দেশের যে কোনো দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় অতিদ্রুততার সঙ্গে সামষ্টিক শক্তি নিয়ে নেতাকর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়া যেমন, তেমনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এমনকি রাষ্ট্রীয় অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের ও প্রেরণার উৎস হয়ে উঠল ফাউন্ডেশন। অর্থাৎ জেডআরএফ আর্তমানবতার সেবার কাজ করছে দুভাবে, সরাসরি এবং প্রভাব বিস্তারে।

প্রতিষ্ঠার শুরুতে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কার্যকলাপ নিয়ে বলতে গিয়ে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান বলেছেন, "রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় আছে, রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাবে তখন তাঁর আদর্শ, পলিসি অনুযায়ী মানুষের জন্য কাজ করবে। কিন্তু ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনের মতো কাজ করছে। যতটুকু সামর্থ্য আছে এর ভেতর থেকে আমরা চেষ্টা করবো মানুষের জন্য কাজ করতে। মূল বিষয়টা হচ্ছে মানুষ। মানুষকে সহযোগিতা করা, মানুষকে সাহায্য করা। এটিই হচ্ছে ফাউন্ডেশনের মেইন উদ্দেশ্য। আমরা যার নামে ফাউন্ডেশন করেছি, শহীদ জিয়া মানুষের জন্য কাজ করেছেন। এর বহু সাক্ষ্য আছে। বহু প্রমাণ রেখে গেছেন। আমি আবারো বলবো যে, আসুন আমরা চেষ্টা করি। মানুষের জন্য যেন ভালো কিছু করতে পারি। দেশের জন্য করতে পারি। আমরা সবাই মিলে যদি অল্প অল্প করে করি- আমরা অনেক বড় কিছু, ভালো কিছু করতে পারবো। ইনশাআল্লাহ।"

১৯৯৭ সালে জনাব তারেক রহমান এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল আর্তমানবতার সেবা করার পাশাপাশি অন্য সংগঠনের প্রতিও আহ্বান রাখা যেন তারাও সেবার ব্রত নিয়ে সহজেই এগিয়ে আসে। তখনকার সহকর্মীদের নিকট থেকে তারেক রহমানের এমন মনোভাবের কথা আমরা পরবর্তীকালে জানতে পারি। সেসময় তিনি যে স্লোগানটি তৈরি করছিলেন তা হলো 'একটি উদ্যোগ, একটু চেষ্টা/এনে দিবে সচ্ছলতা, দেশে আসবে স্বনির্ভরতা'। অতঃপর এই স্লোগানটিই হয়ে উঠেছে ফাউন্ডেশনের মূলমন্ত্র। শুরুর সময় থেকে অদ্যাবধি এর উপর ভিত্তি করেই সংগঠনের কার্যক্রম চলমান আছে। দেশের নিরন্তর ভবিষ্যতেও এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে চলবে সকল কার্যক্রম।

বাংলাদেশের জন্য সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক দর্শন, সামাজিক মুক্তির সনদ এবং আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠনের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে এই স্লোগানে। এদেশের জনগণ যেন পরনির্ভরশীল না থাকে! নিজেরাই যেন ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক উন্নতি ঘটাতে পারে! দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে নিজেদের উদ্যোগের যেন সফল বাস্তবায়ন করতে পারে! এই যে আন্তরিক আহ্বান মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির, তা এক কথায় অনন্য। প্রান্তিক পর্যায়ে এ এমন এক প্রণোদনা যা সমাজের সকল স্তরে প্রভাব বিস্তার করছে। কথাটি প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে এবং একেবারে প্রাঞ্জল–একটি উদ্যোগ নিন, একটু চেষ্টা করুন, নিজে সচ্ছল হোন, দেশকে স্বনির্ভর করুন। উন্নয়নশীল বিশ্বে সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হলো প্রান্তিক মানুষকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধির গতিপথ সাজানো। দানশীলতার প্রচলিত বৃত্ত ভেঙে মানুষের ভেতরের সৃজনশীল ও কর্মমুখী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার যে প্রত্যয় এই স্লোগানে উচ্চারিত হয়েছে, তা সমকালীন সমাজবাস্তবতায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

স্লোগান অপরিহার্য হয়ে ওঠে মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরে এবং আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায়। সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতি নির্ভর করে ঐ জনগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানের ওপর। পরনির্ভরশীলতা মানুষকে হীনম্মন্য করে তোলে, পক্ষান্তরে একটি ক্ষুদ্র সুযোগ মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যমী করে তোলে। এই স্লোগানের প্রথম দুটি শব্দ–'একটি উদ্যোগ' ও 'একটু চেষ্টা'–সরাসরি আঘাত হানে অলসতা ও ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে থাকার মতো প্রাচীন মানসিকতার বিরুদ্ধে।

প্রায়ই একজন প্রতিভাবান কিংবা পরিশ্রমী মানুষ শুধুমাত্র যথাযথ দিকনির্দেশনা বা সামান্য রসদের অভাবে পিছিয়ে পড়ে। সেখানে 'একটু চেষ্টা' এবং একটি কার্যকর 'উদ্যোগ' তাদের সামনে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন করে। আবার, সচ্ছলতা কেবল পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য আনে না, যখন গ্রাম ও তৃণমূল পর্যায়ে ব্যক্তি সচ্ছলতা সমষ্টিগত রূপ নেয়, তখনই জাতীয় অর্থনীতি অর্জন করে প্রকৃত 'স্বনির্ভরতা'। খাদ্য বা অর্থ সাহায্য সাময়িক ক্ষুধা মেটাতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে না। মানুষের হাতে হাতে উপার্জনের হাতিয়ার

তুলে দেওয়া এবং আত্মকর্মসংস্থানের পরিবেশ তৈরি করে দেয়াই একটি জাতির টেকসই সমৃদ্ধির প্রধান চাবিকাঠি।

আর্তমানবতার সেবাধর্মী স্লোগান প্রধানত দুভাবে মূল্যায়িত হয়। মানবতার সেবায় চিরাচরিত দাতব্য মডেল (Charity Model) ও ক্ষমতায়ন মডেলের (Empowerment Model) মধ্যে মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। চিরাচরিত ত্রাণতত্ত্ব মানুষকে সাহায্যগ্রহীতা হিসাবে বিবেচনা করে, আর ক্ষমতায়ন মডেল মানুষকে পরিবর্তনের মূল কারিগর হিসাবে দেখে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের এই দর্শন মূলতঃ আত্মমানবতার সেবার মাধ্যমে জন-ক্ষমতায়নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্লোগান যখন সংগঠনের মূলমন্ত্র হয়, তখন বাংলাদেশের মতো কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির দেশে প্রভাব পড়ে নানাভাবে। উন্নত জাতের বীজ বিতরণ, আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির সাথে পরিচয় এবং পতিত জমির সদ্ব্যবহারের উদ্যোগ কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়। এটি পরোক্ষভাবে খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি মজবুত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনবহুল দেশে খাদ্য নিরাপত্তার ভিত মজবুত করার বৃহত্তর অঙ্গীকার ও বাঞ্ময় হয়ে ওঠে এই স্লোগানের সমগ্র পরিসরে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বাঁধভাঙা জোয়ার এমনকি পরবর্তী আরো আরো জোয়ারের ধারাক্রমে বাংলাদেশকে সঠিক পথে দেখতে চাওয়ার জন্য প্রয়োজন জনগণের প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়ন। প্রান্তিক যুবসমাজকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষম করে তোলা হবে আত্মমানবতার সর্বোচ্চ সেবা। এর মাধ্যমে বেকার যুবক হয়ে উঠবে পরিবারের উপার্জনক্ষম শক্তি। ব্যক্তি থেকে সমাজ, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তম পর্যায়ের সমৃদ্ধি নির্ভর করবে স্লোগানের মৌলিক চেতনার বিকাশে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তৃণমূল থেকে বৃহত্তর সামাজিক সচেতনতা তৈরি হতে পারে সাংগঠনিক দর্শনের ভিত্তিতে নির্ধারিত কার্যক্রমে। স্বাস্থ্যসেবাকে প্রেসক্রিপশন-নির্ভর না রেখে স্বাস্থ্য সচেতনতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও প্রাথমিক চিকিৎসার সহজলভ্যতার উদ্যোগ মানুষের গড় আয়ু ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। মহামারী, অতিমারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাংগঠনিক শক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে আর্তমানবতার সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান তার স্লোগানের মধ্যে দিয়ে সেবার বৃহত্তর পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

আর্তমানবতার প্রকৃত সেবা তখনই অর্জিত হয়, যখন একজন নিঃস্ব মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের কারিগর হয়ে ওঠে। আবার দলীয় অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নির্মাণ করে জাতীয় সমৃদ্ধি। সামষ্টিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য অর্জিত হয় যখন একক স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারাবাহিকতা থাকে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের যেসব মানবিক সংগঠন যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, তাদের সবারই মূল ভিত্তি ছিল 'আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক উদ্যোগ'। 'বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি' সংক্ষেপে ব্র্যাক (BRAC) আজ বৈশ্বিক মানবিক অঙ্গনে একটি মডেল। তাদের আল্ট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম প্রমাণ করেছে যে, প্রান্তিক নারীকে শুধুমাত্র অর্থ না দিয়ে সম্পদ (যেমন গবাদিপশু) ও প্রশিক্ষণ দিলে কয়েক বছরের মধ্যে তারা চরম দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে স্থায়ীভাবে বেরিয়ে আসতে পারে।

জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট (IFRC) নামক সংস্থাটি কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ব্যক্তি ও সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়, যা মূলত জনমানুষের নিজস্ব চেষ্টারই আনুষ্ঠানিক রূপ। প্রতিষ্ঠান কাজ করে সহযোগী হিসাবে। 'একটি ন্যায়সঙ্গত ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব' বিনির্মাণে অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল (Oxfam) এর কাজ শুধুমাত্র ত্রাণ বিতরণে সীমাবদ্ধ নয়; তারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি, অধিকার সচেতনতা এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকা নিশ্চিতকরণে কাজ করে। এমনি আরেকটি প্রতিষ্ঠান 'দ্য কার্টার সেন্টার (The Carter Center)'। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা রোগ নিরাময় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৃণমূলের মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে গিনি ওয়ার্ম দূরীকরণে তারা প্রতিটি গ্রামের মানুষকে যুক্ত করেছিল, যা প্রমাণ করে সমন্বিত উদ্যোগের শক্তি কতখানি। এই রোগ বর্তমানে নির্মূলের পথে। বৈশ্বিক এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণ করে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের দর্শন ও আর্তমানবতার সেবার প্রকৃত ব্রত এবং তা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ভাবনার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

জনাব তারেক রহমানের নির্দেশনায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। 'একটি উদ্যোগ, একটু চেষ্টা/এনে দিবে সচ্ছলতা, দেশে আসবে স্বনির্ভরতা'–স্লোগানটিকে সামনে রেখে বিগত ২৭ বছরে ফাউন্ডেশন যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

বৃত্তি প্রকল্প

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী সামনে রেখে দেশের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তার লক্ষ্যে ২০০৫ সালে বৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে এই প্রকল্প। ২০২৩ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সারা দেশব্যাপী শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করা হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুম-খুন, নির্যাতিত, অসহায় ও অসচ্ছল জেলাভিত্তিক বিএনপি নেতাকর্মীর ১৯ জন সন্তানকে শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই বৃত্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও চিকিৎসাসেবা

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী, শাহাদাৎবার্ষিকী, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসসহ জাতীয় বিভিন্ন দিবসে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে। এসব হেলথ ক্যাম্পে বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসাসেবাসহ ঔষধ বিতরণ করা হয়। খুলনার রূপসা, ঢাকার যাত্রাবাড়ি, কড়াইল, রাজবাড়ী মাঠ, গাজীপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে জেডআরএফ। এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্লাস্টিক ও রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি

জার্মান বিশেষজ্ঞ প্লাস্টিক সার্জারি টিমকে আহ্বান করে বাংলাদেশে এনে বগুড়া, খুলনা ও গাইবান্ধায় প্লাস্টিক ও রিকস্ট্রাকটিভ সার্জারি ক্যাম্প করা হয়। উক্ত ক্যাম্পসমূহে প্রায় ৪৫০ জন ঠোঁট কাটা, তালুকাটা ও পোড়া রোগীকে বিনামূল্যে অপারেশন ও চিকিৎসা করা হয়। বগুড়া, খুলনা, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন জেলায় এর ধারবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

অ্যাজমা কেয়ার এ্যান্ড প্রিভেনশন সেন্টার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিশাল অংশের মানুষ অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঢাকার অ্যাজমা সেন্টারটি একমাত্র

সমন্বিত অ্যাজমা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। কিন্তু এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য মাত্র একটি কেন্দ্র অপ্রতুল। অ্যাজমা রোগীদের চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে বগুড়া এবং ২০০৪ সালে চট্টগ্রামে দুটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৬ সাল পর্যন্ত দুই কেন্দ্রে মোট ৯ হাজারের বেশি রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। এ কার্যক্রম বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। নিয়মিত অ্যাজমা রোগের আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে আঞ্চলিক চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে জেডআরএফের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

কমল পানি প্রকল্প

ঢাকার আফতাবনগরের কাছে বালু নদীর তীরে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও আধুনিক পয়ঃশোধনাগার দাসের কান্দিতে। এখানে প্রতিদিন প্রায় ৫০ কোটি লিটার (৫,০০,০০০ ঘনমিটার) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করা হয়। এর মাধ্যমে ঢাকার আধুনিক স্যানিটেশন সেবার আওতা বৃদ্ধি পেলেও এ এলাকার মানুষ বিশুদ্ধ পানির মারাত্মক সংকটে পড়ে। ফলে তাদের নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ অবস্থা দীর্ঘদিনের। ঢাকার খিলগাঁও থানাধীন নাসিরাবাদ ইউনিয়নের এই দাশেরকান্দি গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সহযোগিতায় কমল পানি প্রকল্প শুরু হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহকৃত পরিবারের সংখ্যা ১২০টি। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতাভূক্ত পরিবারের সংখ্যা ১৬০টি।

কমল বীজ প্রকল্প

বাংলাদেশের কৃষকরা জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অবিশ্বাস্য বিষয় হচ্ছে মাত্র ৭ ভাগ কৃষক উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে। কৃষকদের জন্য উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন, ন্যায্যমূল্যে বিতরণ এবং বীজ উৎপাদনবিষয়ক প্রশিক্ষণের নিয়মিত ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হাত-পা হারানো মানুষদের কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে এখন পর্যন্ত হাত-পা হারানো বহু মানুষ চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত শহীদ ও গুম-খুনের শিকার পরিবারের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাশে থেকে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে জেডআরএফ।

করোনা মহামারি মোকাবিলা

মহামারির সময় জেডআরএফের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ২৪ ঘণ্টার স্বাস্থ্যসেবা হটলাইন ও টেলিমেডিসিন, বিনামূল্যে অক্সিজেন সরবরাহ, হোম হেলথ সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পিপিই প্রদান, হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন, জীবাণুনাশক স্প্রে, স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক প্রচার, খাদ্য ও ঔষধ বিতরণ এবং স্বাস্থ্যসামগ্রী সরবরাহ। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য ইফতার সামগ্রীও বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা

করোনাকালে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। এ উদ্যোগের একাধিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

করোনার শুরুতেই জনসচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অক্সিজেন সরবরাহ

করোনা মহামারীকালে অসহায় জনগণের মাঝে বিনামূল্যে জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ ছিল ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কাজ। করোনা আক্রান্ত কোন রোগীর স্বজন অক্সিজেনের জন্য ফাউন্ডেশন নির্ধারিত চিকিৎসকের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের নিকট অক্সিজেন সরবরাহ করা হতো।

জরুরি হটলাইন স্বাস্থ্যসেবা চালু

দেশ যখন ভয়াল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, তখন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাব যৌথভাবে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে সাথে নিয়ে করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ এবং প্রাথমিক জরুরি স্বাস্থ্যসেবার জন্য ২৪ ঘণ্টার মোবাইল হটলাইন সেবা চালু করে। রোগের ধরন বুঝে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে ফোনে সংযুক্ত করে দেয়ার পাশাপাশি সমস্যা জেনে টেলিফোনেই রোগীকে প্রেসক্রিপশন দেয়া হয় রোগীর চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ রোগীর বাড়ি পৌঁছানোর জন্য একটি টিম বিনামূল্যে সেবাদানে নিয়োজিত ছিল। এছাড়া অতি গরীব, যাদের ঔষধ কেনার সক্ষমতা নেই তাদের জন্য ফ্রি ওষুধের ব্যবস্থা করেছিল ফাউন্ডেশন।

প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পিপিই প্রদান

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দেয়ার পর যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারদের পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সরবরাহের বিষয়ে সরকারি হাসপাতালগুলো তখন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে, এমনকি বেসরকারি হাসপাতালগুলোও ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিল। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে দেশের প্রায় শতাধিক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরতদের জন্য কয়েক হাজার পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) প্রদান করা হয়।

ফেসবুক স্বাস্থ্যসেবা

করোনা বিশ্বমহামারির দুঃসময়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন জনগণের মাঝে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সেসময় বিভিন্ন রোগ যেমনড় কিডনি সমস্যা, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের সমস্যা, প্রসূতি মায়ের শারীরিক সমস্যা, করোনা সংক্রমণকালে সৃষ্ট মানসিক সমস্যা, শিশুদের সুরক্ষা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা এবং অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এই স্বাস্থ্যসেবা ফেসবুক গ্রুপের লাইভে দেয়া হয়।

হাত ধোয়ার জন্য বেসিন স্থাপন প্রকল্প

বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতা আর দেশের মানুষের জন্য সীমাহীন ভালবাসা নিয়ে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকার অন্যতম করণীয় সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন স্থাপন করেছেন সেসময়ে। সঙ্গে দেয়া হয়েছিল সাবান এবং পানি।

করোনা ও ডেঙ্গু জীবাণুমুক্তকরণ সেবা

বাংলাদেশে মূর্তিমান এক আতঙ্ক ডেঙ্গু প্রতিবছরই হানা দেয়। এর ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায়, মানুষ যাতে করোনা ও ডেঙ্গু সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে পারে সেজন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন জরুরি হটলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি জীবাণুমুক্তকরণ সেবা দিতে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে জীনাণুনাশক স্প্রে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ফাউন্ডেশনের কৃষিবিদ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন।

সংগঠনের সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্যসামগ্রী প্রদান

সংক্রমণের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সদস্যরা করোনা মোকাবেলায় অক্লান্ত শ্রম দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন নিজ সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টিও আমলে নিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কর্মরত জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই), মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে সেই সময়ে। করোনা দুর্যোগের সেই সময়ে ৭টি জেলায় একত্রে বন্যা দেখা দিলে সেখানেও খাদ্য বিতরণ করা হয়, পাশাপাশি বন্যার পরপরই কৃষকদের মাঝে কমল বীজ বিতরণ করা হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষের মাঝে সেই সময় দেশব্যাপী খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছিল জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য যে, প্রতিবছর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সর্বদাই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সম্মানে ইফতার মাহফিল

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সম্মানে ইফতার মাহফিল কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল করোনাকালীন সময়ে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় হাসপাতালে কর্মরত সকল চিকিৎসক, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, অফিস স্টাফ, করোনায় আক্রান্ত রোগী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

করোনা ঝুঁকি মোকাবেলায় টেলিমেডিসিন সেবা

করোনা আক্রমণের ভয়ে মানুষ যখন ভীতসন্ত্রস্ত, সকল ধরণের রোগীদের জন্য হাসপাতাল যাওয়া যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ তখন ২৪ ঘন্টার জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়। বিভিন্ন ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম-যেমন মোবাইল, স্কাইপি, ফেসবুক ইত্যাদি ব্যবহার করে হতাশার সাগরে ছুটে চলা মানুষকে সেবা দিয়েছিল মানবতার এই রণতরী জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন।

করোনাকালীন হোম হেলথ সার্ভিস

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টার হোম হেলথ সার্ভিস কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেই সময়ে। টেলিফোনের মাধ্যমে অবহিত করলে রোগীর বাসায় এ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যেত। জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহের দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বাসায় তা পৌঁছে যেত। প্রয়োজনবোধে স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর ব্লাড প্রেসার, হার্ট রেট, পালস রেট, জ্বরের পরিমাণ এবং ব্লাড সুগার লেভেল নির্ণয় করে দিয়েছিলেন সেই সময়ে।

মানব সেবায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জেডআরএফ

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে জেডআরএফ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও মানব সেবায় অবদান রেখে চলেছে। তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য শীতবস্ত্র কম্বল প্রেরণ করা হয়েছে।

করোনাকালীন ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা

বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্মকে অল্প বয়স থেকেই বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে, তাদের মন থেকে বিজ্ঞান ভীতি দূর করতে এবং বিজ্ঞান চর্চায় তাদেরকে আগ্রহী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে করোনাকালীন বৈশ্বিক মহামারীর সময় বাংলাদেশে প্রথম একটি ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। ভয়াবহ দুর্যোগে সবাই যখন গৃহবন্দি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তালা ঝুলছে, শিক্ষার্থীরা যখন ভীত সন্ত্রস্ত, অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন ঠিক সেই সময়ে ফাউন্ডেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান-এর সরাসরি নির্দেশনায় ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা শিক্ষার্থীদের প্রাণচঞ্চল করেছিল। বর্তমানে বৃহৎ পরিসরে বাৎসরিক এই বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়।

সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রের শক্তি তার আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি ও সচেতন নাগরিক শক্তিতে নিহিত থাকে। বাংলাদেশ যখন জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মতো বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, তখন আত্মনির্ভরতার আহ্বান আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হলে যুবশক্তিকে বোঝা না বানিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে তৃণমূলের পাঠশালা পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রায়োগিক ও কর্মমুখী করতে হবে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের এই স্লোগান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কোনো পরিবর্তনই আকাশ থেকে নেমে আসে না; পরিবর্তন জন্ম নেয় মাটিতে ঘাম ঝরানো ক্ষুদ্র একটি 'উদ্যোগ' এবং অবিচল 'চেষ্টা' থেকে।

'একটি উদ্যোগ, একটু চেষ্টা/এনে দিবে সচ্ছলতা, দেশে আসবে স্বনির্ভরতা–এই বাণী কেবল লিপিবদ্ধ থাকার বিষয় নয়। কর্মের মাধ্যমে প্রতিদিনের জীবনে ধারণ করার আহ্বান আছে এই স্লোগানে। ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র প্রতিটি ধাপে যখন পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ এক বিন্দুতে মিলবে, তখনই তৈরি হবে দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণহীন ও আত্মনির্ভরশীল একটি আধুনিক বাংলাদেশ। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে সমষ্টিগত এই যাত্রায় শামিল হওয়াই ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দের যৌথ অঙ্গীকার।

আর্তমানবতার সেবায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন বর্তমানে তার সোনালি সময় পার করছে। ফাউন্ডেশনের সদস্যদের দৃঢ় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশে মানবতার পতাকা উড়বে বাংলাদেশে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত একটি স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ায় জনাব তারেক রহমানের স্লোগানটি হৃদয়ে ধারণ করার বিকল্প নেই।

লেখক : অধ্যাপক ও গবেষক; চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিরেক্টর, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন।



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের লিগ্যাল এইড সেলের এক অনন্য অভিযাত্রা

অ্যাডভোকেট আশরাফ জালাল মনন



সময়টা ২৮ অক্টোবর ২০২৩। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখন এক উত্তাল ও সংকটময় সময়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীরা রাজপথে আন্দোলন করছিলেন। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে মামলা, গ্রেপ্তার, হয়রানি, নির্যাতন এবং কারাবন্দিত্বের ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক মামলা দায়েরের ফলে অসংখ্য পরিবার আর্থিক ও মানসিক সংকটে পড়ে।

এই কঠিন বাস্তবতায় শুধু রাজপথের আন্দোলন নয়, আইনের আদালতেও একটি সুসংগঠিত লড়াই প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকেই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের লিগ্যাল এইড সেলের যাত্রার সূচনা। তৎকালীন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমানের নির্দেশনায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী ও সমন্বিত আইন সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৩ নভেম্বর ২০২৩ দেশের শীর্ষ পর্যায়ের খ্যাতনামা আইনজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের লিগ্যাল এইড সেল। বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আলীকে আহ্বায়ক এবং বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আশরাফ জালাল খান মননকে সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শুরু থেকেই এই সেলের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট–অর্থের অভাবে যেন কোনো নির্যাতিত বা মামলা-আক্রান্ত নেতাকর্মী আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হন।

বিনা পারিশ্রমিকে আইনি সহায়তার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা সাধারণত অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। একজন আসামির জামিন, নিম্ন আদালতের কার্যক্রম, উচ্চ আদালতে আবেদন, আপিল, মামলা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ–প্রতিটি পর্যায়েই বিপুল অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। আন্দোলনরত অনেক নেতাকর্মী ছিলেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকা, আদালতে হাজিরা দেওয়া এবং একের পর এক মামলা মোকাবিলা করা তাদের জন্য ছিল প্রায় অসম্ভব এক বাস্তবতা।

লিগ্যাল এইড সেল সেই জায়গাতেই মানবিক ও আইনগত দায়িত্ব গ্রহণ করে। আইনজীবীরা নিজেদের পেশাগত সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে অসংখ্য মামলা পরিচালনা করেন। অনেক ক্ষেত্রে মামলার বাদী-বিবাদী, থানার নথি, এজাহার, চার্জশিট ও আদালতের নথিপত্র পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় আইনি কৌশল নির্ধারণ করা হয়। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত পর্যন্ত মামলার প্রয়োজন অনুযায়ী আইনজীবীদের সমন্বয় করা হয়। এই কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল–এটি শুধু রাজধানীকেন্দ্রিক ছিল না। ঢাকার বাইরে রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা বিভাগের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড সেলের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের আইনজীবীদের সঙ্গে সমন্বয় করে অসংখ্য মামলা পরিচালনা করা হয়। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার একজন সাধারণ নেতাকর্মীও প্রয়োজনের সময় আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পান।

আইনজীবীদের পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে মানবিক অঙ্গীকার

লিগ্যাল এইড সেলের কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আইনজীবীদের মানবিক অঙ্গীকার। একজন আইনজীবীর কাছে আদালতে মামলা পরিচালনা শুধু পেশাগত দায়িত্ব নয়; ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সেই দর্শন থেকেই জেডআরএফের লিগ্যাল এইড সেলের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ছাড়াই মামলা পরিচালনা করেন।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব অধ্যাপক ড. ফরহাদ হালিম ডোনারের তত্ত্বাবধান এবং ফাউন্ডেশনের সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় এই কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়। মামলা পরিচালনার পাশাপাশি কারাগারে থাকা নেতাকর্মীদের জামিন, আইনি পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় আদালত-সংক্রান্ত সহযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে হাজার হাজার মামলা বিনামূল্যে পরিচালনা করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নেতাকর্মীর মুক্তির ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড সেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংখ্যাটি শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়; প্রতিটি সংখ্যার পেছনে ছিল একটি পরিবার, একজন মা-বাবা, একজন স্ত্রী বা সন্তান এবং একজন মানুষের মুক্তির অপেক্ষা।

একজন কর্মীর জামিন মানে শুধু একজন মানুষের কারামুক্তি নয়–একটি পরিবারের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ। সেই

মানবিক উপলব্ধিই লিগ্যাল এইড সেলের কাজকে একটি সাধারণ আইন সহায়তা কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

আদালতের পাশাপাশি সচেতনতা ও সংগঠিত প্রস্তুতি

লিগ্যাল এইড সেলের অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে আরও বিস্তৃত পরিসরে কাজে আসে। ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের লিগ্যাল এইড সেলকে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৭ আসনে আইন সহায়তা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ সময় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য এবং লিগ্যাল এইড সেলের সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আশরাফ জালাল খান মননকে আহ্বায়ক এবং ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য ব্যারিস্টার এজাজ কবিরকে সদস্য সচিব করে ১৯ সদস্যের একটি আইন সহায়তা কমিটি গঠন করা হয়।

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশনায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য অ্যাডভোকেট আশরাফ জালাল খান মননকে আহ্বায়ক এবং ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য ব্যারিস্টার এম শাকিবুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে ৭৫ সদস্যের একটি আইন উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

এই দুই কাঠামোর মাধ্যমে আইন সহায়তা কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। নির্বাচনী আইন ও বিধিমালা বিশ্লেষণ, ভোটার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনগত সচেতনতা সৃষ্টি, নির্বাচনী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনের সময় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ধরনের টিম গঠন করা হয়।

নির্বাচনকালীন আইনগত সহায়তা

নির্বাচনের সময় আইনগত জটিলতা দ্রুত সৃষ্টি হতে পারে। একটি অভিযোগ, একটি মামলা, একজন কর্মীর আটক কিংবা কোনো নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ–এসব ক্ষেত্রে দ্রুত আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তবতা বিবেচনায় লিগ্যাল এইড সেলের উদ্যোগে নির্বাচনী মনিটরিং টিম এবং র‍্যাপিড মোবাইল টিম গঠন করা হয়।

মনিটরিং টিমের মাধ্যমে নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, সম্ভাব্য আইনগত বিচ্যুতি শনাক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা পরিষদকে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে র‍্যাপিড মোবাইল টিমের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সাধারণ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের হয়রানি বা আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হলে দ্রুত সেখানে পৌঁছে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

ফলে লিগ্যাল এইড সেলের কার্যক্রম কেবল মামলা পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি ধীরে ধীরে আইন, অধিকার, নির্বাচন ও নাগরিক সচেতনতার একটি সমন্বিত সহায়তা ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

একটি সংগঠনের মানবিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মূল দর্শনের সঙ্গে লিগ্যাল এইড সেলের কার্যক্রমের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কল্যাণে চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগকালীন সহায়তা এবং বিভিন্ন মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সেই মানবিক কর্মকাণ্ডেরই একটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো–অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ও বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা।

কারণ একজন দরিদ্র মানুষের কাছে ন্যায়বিচারও অনেক সময় একটি ব্যয়বহুল অধিকার। মামলা করার বা মামলা মোকাবিলা করার সামর্থ্য না থাকলে আইনের সমান আশ্রয় পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। লিগ্যাল এইড সেল সেই ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছে।

জেডআরএফের আইনজীবীরা দেখিয়েছেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শুধু অর্থ বা ত্রাণের প্রয়োজন হয় না; কখনো প্রয়োজন হয় জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা, সময় এবং সাহস। একজন আইনজীবীর হাতে থাকা আইনের জ্ঞানও মানুষের সেবার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে।

ভবিষ্যতের পথ

লিগ্যাল এইড সেলের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, একটি সুসংগঠিত আইন সহায়তা ব্যবস্থা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সময়ে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তাবলয় তৈরি করতে পারে। ভবিষ্যতে এই সেলের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় মানুষকে আইনগত পরামর্শ দেওয়া, সাধারণ মানুষের মধ্যে মৌলিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় আইনি সহায়তা এবং তরুণ আইনজীবীদের মানবিক আইনসেবায় উৎসাহিত করার মতো উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের লিগ্যাল এইড সেলের যাত্রা তাই শুধু কিছু মামলা পরিচালনা বা কিছু মানুষের জামিন নিশ্চিত করার ইতিহাস নয়। এটি প্রতিকূল সময়ে পেশাগত দক্ষতাকে মানব সেবার সঙ্গে যুক্ত করার একটি প্রয়াস। আদালতের কাঠগড়ায় যখন একজন অসহায় মানুষ দাঁড়ান, তখন তার পাশে একজন আইনজীবীর দাঁড়িয়ে যাওয়াই কখনো কখনো হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় মানবিক সহায়তা।

২৮ অক্টোবর ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া এই অভিযাত্রা সেই বিশ্বাসকেই ধারণ করে–অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু রাজপথে নয়, আইনের পথেও হতে পারে। আর সেই লড়াইয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের লিগ্যাল এইড সেলের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সেলের পথচলা আরও সুদূরপ্রসারী হোক–এই প্রত্যাশাই রইল।

লেখক : আইনজীবী



মানুষের সেবায় জেডআরএফ-এর সঙ্গে আমার পথচলা

ডা. আমিরুল ইসলাম পাভেল



কিছু সম্পর্কের শুরু হয় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে, আর কিছু সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে হয়ে ওঠে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিছু প্রতিষ্ঠান কেবল কাজ করার জায়গা নয়, হয়ে ওঠে শেখার, নিজেকে গড়ে তোলার এবং মানুষের জন্য কিছু করার অনুপ্রেরণা। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন–জেডআরএফের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক তেমনই।

একজন তরুণ চিকিৎসক হিসাবে পেশাজীবন শুরু করার পরপরই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আমার পথচলা শুরু। এরপর কেটে গেছে এক দশকেরও বেশি সময়। এই দীর্ঘ পথচলায় আমি শুধু একজন স্বেচ্ছাসেবক বা আয়োজক হিসাবে কাজ করিনি; শিখেছি মানুষের পাশে দাঁড়াতে, দায়িত্ব নিতে, দলবদ্ধভাবে কাজ করতে এবং সংকটের সময় মানুষের কষ্টকে নিজের দায়িত্ব বলে ভাবতে। আজ পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, জেডআরএফের সঙ্গে আমার এই যাত্রা আসলে মানবিক হয়ে ওঠারই এক নিরন্তর শিক্ষা।

যে অনুপ্রেরণার শুরু ২০০৫ সালে

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্তের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ২০০৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কার, সনদ ও সম্মাননা গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন প্রয়াত সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন পিন্টু। আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন তারেক রহমান। পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তে তাঁর ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি তাঁর বিনয় আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল।

সময়ের সঙ্গে চিকিৎসক হয়েছি, পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেছি। কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করার যে আকাঙ্ক্ষা, তা কেবল নিজের পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইনি। সেই ভাবনা থেকেই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা আরও গভীর হয়েছে।

ডোনার স্যারের সান্নিধ্যে নেতৃত্বের পাঠ

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার স্যারের দিকনির্দেশনা আমার এই পথচলায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি, একটি কর্মসূচি সফল করার জন্য শুধু সদিচ্ছা থাকলেই হয় না; প্রয়োজন পরিকল্পনা, সমন্বয়, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ এবং একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা।

একজন চিকিৎসক হিসাবে রোগী দেখা ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া আমার পেশাগত দায়িত্ব। কিন্তু একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনা করা, স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয় করা, মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া কিংবা একটি বড় কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এসবের জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ধরনের দক্ষতা। জেডআরএফে কাজ করতে গিয়ে আমি সেই দক্ষতাগুলো অর্জনের সুযোগ পেয়েছি।

দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে

বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতাগুলো আমার স্মৃতিতে বিশেষভাবে জায়গা করে আছে। জামালপুরে বন্যার পর জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে মানুষের দুর্ভোগ কাছ থেকে দেখেছি। ঘরবাড়ি, জীবিকা ও স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে চিকিৎসাসেবা মানুষের জন্য কতটা জরুরি হয়ে ওঠে, তা এসব অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন করে উপলব্ধি করিয়েছে।

২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় কুমিল্লার দুর্গত এলাকায় মেডিক্যাল ক্যাম্পের কার্যক্রমেও যুক্ত ছিলাম। একই বছর ফেনীর পরশুরামে বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সবজির বীজ, পোল্ট্রির ঔষধ, মুরগি ও মাছের পোনা বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

করোনাকালে সেবার এক কঠিন অধ্যায়

করোনাভাইরাস মহামারির সময় মানুষের অনিশ্চয়তা, ভয় ও অসহায়ত্ব ছিল অন্যরকম। চিকিৎসক হিসাবে সেই সময়ের দায়িত্ববোধ আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। জেডআরএফের উদ্যোগে এবং ডোনার স্যারের দিকনির্দেশনা ও তারেক রহমানের নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হয়েছে। মহামারির সময় ফাউন্ডেশনের আওতায় টেলিমেডিসিনের মাধ্যমেও চিকিৎসাসেবা দিয়েছি।

সেই সময়ে উপলব্ধি করেছি, চিকিৎসা সব সময় হাসপাতালের দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনো একটি ফোনকল, সঠিক পরামর্শ কিংবা উদ্বিগ্ন একজন মানুষকে আশ্বস্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ সেবা হয়ে ওঠে।

সংকটের সময় একজন চিকিৎসকের জ্ঞান ও দক্ষতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মানবিক সংবেদনশীলতা। করোনাকালের অভিজ্ঞতা আমার কাছে চিকিৎসাসেবার এই মানবিক দিকটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

মানবসেবার বিস্তৃত পরিসর

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে গিয়ে দেখেছি, মানুষের প্রয়োজন বহুমাত্রিক। কোথাও স্বাস্থ্যসেবা, কোথাও শিক্ষা, কোথাও কৃষি ও জীবিকার সহায়তা, আবার কোথাও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কিংবা আহত মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জুবাইদা রহমানের উদ্যোগে বগুড়ায় বিনা মূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও ছানি অপারেশন ক্যাম্পের আয়োজক হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমার জন্য স্মরণীয়। একজন মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া শুধু একটি চিকিৎসাগত সাফল্য নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাঁর পরিবার, দৈনন্দিন জীবন এবং নতুন করে স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের পরিবারের জন্য ঈদ উপহার বিতরণ কার্যক্রমে ঢাকা বিভাগীয় কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। ঢাকা মহানগর দক্ষিণে শহীদদের পরিবারের কাছে ঈদ উপহার পৌঁছে দেওয়ার কাজেও যুক্ত ছিলাম। এসব পরিবারের কাছে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের শোক ও বেদনার প্রতি সম্মান দেখানোও ছিল আমাদের মানবিক দায়িত্বের অংশ।

আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমেও ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হয়েছে। অধ্যাপক ডা. আমান উল্লাহ ও ডা. পারভেজ রেজা কাকনের তত্ত্বাবধানে রিহ্যাবিলিটেশন সেলের কার্যক্রমে জাতীয়তাবাদী চেতনার আহত রোগীদের চিকিৎসা ও বিনা মূল্যে সেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

হাম প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে মিরপুর মাজার রোড ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ এলাকায় আয়োজক হিসাবে অংশ নিয়েছি। ডেঙ্গু ও করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমেও যুক্ত থেকেছি। এসব কাজের মধ্য দিয়ে বারবার মনে হয়েছে, রোগ প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা চিকিৎসা দেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

সংগঠন, দায়িত্ব ও নতুন প্রজন্ম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা-১৪ অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমাকে স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা ও প্রস্তুত রাখার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করেছে। তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ আইডিয়া ফেস্ট ২০২৫ মিনি হ্যাকাথনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলি ফ্যামিলি মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের আয়োজনে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতাও স্মরণীয়।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা ২০২৬-এর কুমিল্লা বিভাগীয় সমন্বয় কমিটিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নতুন প্রজন্মের উদ্ভাবনী চিন্তা ও সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করার গুরুত্ব নতুনভাবে অনুভব করছি। কারণ মানবকল্যাণের কাজ শুধু বর্তমানের সংকট মোকাবিলায় সীমাবদ্ধ নয়; ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সৃজনশীলতার পথে এগিয়ে নেওয়াও সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব।

একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার ঋণ

এই দীর্ঘ পথচলায় আমার ব্যক্তিগত কিছু অর্জনও স্মরণীয় হয়ে আছে। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থে মানবিক নেতৃত্ব ও বাংলাদেশের প্রতি শহীদ জিয়ার অবদান শীর্ষক আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ডা. তাজনীন ওয়ারিস সিমকী ম্যাডাম, পরিচালক, জেডআরএফের সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

একজন চিকিৎসক হিসাবে আমার পেশাগত পরিচয় রয়েছে, জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতা, সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় করে চলা এবং নিজের সামর্থ্যকে বৃহত্তর কল্যাণে কাজে লাগানোর শিক্ষা পেতে জেডআরএফের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আগামী দিনের প্রত্যাশা

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমার প্রত্যাশা, মানুষের কল্যাণে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হোক। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পুনর্বাসন ও তরুণদের বিকাশ প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের বাস্তব প্রয়োজনকে সামনে রেখে উদ্যোগগুলো এগিয়ে যাক। সংকটে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই মানবিক ধারা আরও শক্তিশালী হোক।

আমি কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার স্যারের প্রতি, যাঁর দিকনির্দেশনায় সংগঠনের কাজ থেকে বহু কিছু শিখেছি। কৃতজ্ঞ ফাউন্ডেশনের নেতৃত্ব, সহকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি, যাদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রতিবারই নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

আমার এই যাত্রা এখনো শেষ হয়নি। সামনে আরও অনেক পথ বাকি, অনেক মানুষের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ বাকি। যত দিন সামর্থ্য থাকবে, তত দিন মানুষের কল্যাণে নিজের পেশাগত জ্ঞান, সময় ও শ্রম কাজে লাগাতে চাই।

লেখক: চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্যকর্মী

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমানের মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত



২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : দুধের অভাবে ৭ মাসের হুসাইন-এর দাদির আকুতি শুনে পাশে দাঁড়ালেন ডা. জুবাইদা রহমান

'আমি আমার নাতিটাকে বাঁচাতে চাই'–এই একটি বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে জীবনের শেষতম করুণ আর্তি। নাতির জন্য দাদির এই দরদমাখা উক্তি সোস্যাল মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পারেন আরেক মানবতাবাদি চিকিৎসক জেডআরএফের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। অসহায় দাদির আকুতি শুনে সাত মাসের হুসাইনের চিকিৎসা ও দুধের ব্যবস্থা করলেন ডা. জুবাইদা রহমান।

খুলনার কয়রা উপজেলার বাগালী ইউনিয়নের শ্রিরিফলতলা গ্রামের সাত মাস বয়সী শিশু হুসাইনের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় দুধের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। হুসাইনের বাবা-মা দুজনই অসুস্থ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বৃদ্ধ দাদি, যিনি ভিক্ষা করে সংসার চালান।

মায়ের বুকের দুধ না পাওয়ায় শিশুটির জন্য প্রয়োজনীয় দুধ কেনার সামর্থ্য ছিল না পরিবারের। পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, শিশুটিকে লবণ পানি খাওয়ানো হচ্ছিল। ফলে তার অপুষ্টি, ত্বকের সমস্যা ও মুখে ক্যান্ডিডিয়াসিসের উপসর্গ দেখা দেয় বলে জানানো হয়।

বিষয়টি জানার পর ডা. জুবাইদা রহমান জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর (প্রোগ্রাম) অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহকে প্রয়োজনীয় সহায়তার নির্দেশ দেন।

পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সদস্য ডা. এম. আর. হাসানের তত্ত্বাবধানে শিশু হুসাইন ও তার পরিবারকে কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে শিশুটির চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় দুধ এবং পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

শিশুটির দাদি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি ভিক্ষা করে সংসার চালাই। বাচ্চাটার দুধ কেনার সামর্থ্য আমার নেই। আমি আমার নাতিটাকে বাঁচাতে চাই।' সহায়তার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমান -এর নজরে রাবেয়া, চিকিৎসার দায়িত্বে অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার টিউমার আক্রান্ত রাবেয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমান। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাবেয়া দীর্ঘদিন ধরে মুখে ভয়াবহ টিউমার নিয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সময়মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়ায় এক পর্যায়ে তার একটি চোখ নষ্ট হবার উপক্রম হয় এবং মুখমণ্ডলের বড় একটি অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সম্প্রতি একটি সংবাদ মাধ্যমে রাবেয়ার অসহায়ত্ব ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান-এরর নজরে আসে। এরপর রাবেয়ার উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয় অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহকে। এরই ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের রিহ্যাবিলিটেশন কমিটির মাধ্যমে রাবেয়ার চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৫ অক্টোবর তাকে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরবর্তী চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। রাবেয়াকে ভর্তি করার সময় উপস্থিত ছিলেন বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, ডা. শাওন বিন রহমান এবং জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ডা. এম আর হাসান।

সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী চিকিৎসা পরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন। অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চিকিৎসাসেবায় কাজ করে আসছেন। তাঁর উদ্যোগ ও সম্পৃক্ততায় ইতোমধ্যে ২,৫০০-এর বেশি বিনামূল্যে অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। এবার তাঁর সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানে রাবেয়ার চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে দীর্ঘদিন চিকিৎসাবঞ্চিত রাবেয়ার জন্য এই উদ্যোগ নতুন আশার সঞ্চার করেছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে–এমনটাই প্রত্যাশা তার পরিবার ও স্বজনদের।





প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুকন্যা জুবাইদার সাথে দেখা করতে গেলেন ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ

গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়াল মির্জাপুর ইউনিয়নের দরিদ্র দম্পতি হাবিবুর রহমান ও দিলরুবা আক্তারের কন্যাশিশু হাবিবা জন্ম নেয় বিরল শারীরিক জটিলতা নিয়ে। জন্মগতভাবেই তার দুই মাড়ি ও চোয়াল একসঙ্গে যুক্ত থাকায় সে মুখ খুলতে পারত না এবং স্বাভাবিকভাবে খাবার গ্রহণও করতে পারছিল না। মা তাকে সিরিঞ্জের মাধ্যমে নাকের নল দিয়ে বুকের দুধ খাওয়াতেন। গার্মেন্টসকর্মী বাবার পক্ষে ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

গণমাধ্যমে এ খবর প্রকাশের পর শিশুটির চিকিৎসায় এগিয়ে আসে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ)। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের শিশু হাসপাতালে হাবিবার প্রথম পর্যায়ের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহর তত্ত্বাবধানে এবং ডা. এম. আর. হাসানের সমন্বয়ে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল অপারেশনে অংশ নেয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শিশুটিকে পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে আরও কয়েকটি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে।

সার্জারি টিমের নেতৃত্ব দেন ডা. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ। অ্যানেসথেসিয়া টিমের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক ডা. আকতার হোসেন লোবান। শিশু হাসপাতালে সার্বিক সহায়তা করেন অধ্যাপক ডা. খালিদ মাহমুদ শাকিল। সফল অপারেশনের আনন্দে হাবিবার মা-বাবা শিশুটির নতুন নাম রাখেন 'জুবাইদা' এবং জেডআরএফের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

বরগুনায় ব্যাগে পাওয়া নবজাতকের পাশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমান

বরগুনার বামনা উপজেলার চরাখালী গ্রামে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর থেকে সদ্যোজাত এক মেয়ে শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। শিশুটির শরীরে ক্ষতচিহ্ন এবং চোখে সংক্রমণ দেখা যাওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গত ২৪ আগস্ট চরাখালী গ্রামের বিশ্বরোডসংলগ্ন একটি রাইস মিলের পাশে দোকানের পেছনে তারিক নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে শিশুটিকে দেখতে পান। এ সময় শিশুটির পায়ে পিঁপড়া কামড়াচ্ছিল। তার বুক ও মুখে ক্ষতচিহ্ন এবং চোখে সংক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। পরে বামনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) সহযোগিতায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে স্থানীয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুটিকে আগৈলঝরা ছোটমনি নিবাসে হস্তান্তর করা হয়। এরপর আগৈলঝরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা শিশুটির প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষা করেন। শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মাতুয়াইল শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে রেফার করা হয়।

শিশুটির বিষয়টি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমানের নজরে আসে। এরপর অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহর পরামর্শে ডা. হাসান শিশুটির উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তাকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন।

সদ্যোজাত শিশুটিকে কে বা কারা ওই স্থানে ফেলে গেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করছে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে শিশুটি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে এবং তাকে পরিত্যাগের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর খোঁজে ২০২৬

অংশগ্রহণ করতে পারবে

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দ

নিবন্ধনের শেষ তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর

বিভাগীয় পর্ব : ৩০ অক্টোবর

পুরস্কার

গোল্ড মেডেল
সিলভার মেডেল
ব্রোঞ্জ মেডেল

- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজস্ব মডেল স্বশরীরে উপস্থাপন করতে হবে
- ধারণাটি সম্পূর্ণ মৌলিক ও অনন্য হতে হবে
- পূর্বে উপস্থাপিত কোনো প্রজেক্ট গ্রহণযোগ্য হবে না
- অংশগ্রহণকারীরা জেডআরএফ-এর মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান-এঁর সামনে নিজের প্রজেক্ট উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন।

প্রথম ৫ জন বিজয়ীর জন্য

স্টার্টআপে আকর্ষণীয় আর্থিক সহায়তা

নিবন্ধন ও বিস্তারিত :
https://zrf.info/registration

গবেষণা উদ্ভাবন প্রযুক্তি উন্নয়ন

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের



১৭তম

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

পরিশিষ্ট



একটি জাতির জন্ম কথা

জিয়াউর রহমান



পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মি. জিন্না যেদিন ঘোষণা করলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা– আমার মতে, ঠিক সেদিনই বাঙালি হৃদয়ে অংকুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির। পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজেই ঠিক সেদিনই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন– এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহসিক নগরী ঢাকাতেই মি. জিন্না অত্যন্ত নগ্নভবে পদদলিত করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার। আর এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্না ও তার অনুসারীদের নষ্টামীর। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তির উৎস রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর, আশার নগরীরূপে।

অতি প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় ঢাকা নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে হানাদার, দখলদার, দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যুবাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে। বর্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন কয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি এই সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশ্যে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহখানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে, আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙে দু'ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচি। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাস করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে। অফিসার ক্যাডেটরূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানী বাহিনীতে। স্কুল জীবন থেকে পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুল জীবনেই বহুদিনই শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণ সমাজেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উত্তপ্ত করে দেয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের-বাঙালিকে নিকৃষ্টতর মানব জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনও দিন আসে, তা হলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। সযত্নে এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হল, জোরদার হল। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উদগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বলল আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনে আমি তখন করাচিতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন। পাকিস্তানি সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালিদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো– ভেঙে দাও এর শিরদাড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের উপর ছড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক রূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হল নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নীচে পিষ্ট হল মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়ল বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগল তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম আমরা সবাই। পর্বত ঘেরা অ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা বাঙালি ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমি ক্যাফেটেরিয়াল নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়। এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতগুলো পাকিস্তানি ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করল। আখ্যায়িত করল তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হল না। ঠিক হল এর ফয়সালা হবে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লাভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানি গোয়ার্তুমির মান বাঁচাতে এগিয়ে এল এক পাকিস্তানি ক্যাডেট নাম তার লতিফ (পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। লতিফ প্রতিজ্ঞা করল, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা বলতে না পারি, সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হল মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দু'প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করল। হুমকি দিল বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হল না ৩০ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। আবেদন জানাল সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতেও বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটিকয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো, অসম্মান করতো। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোন স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমির ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমনকি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো- আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা সবসময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানি অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানিদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালি অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভাল সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের সংগ্রামের। এরপর এল আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালাবদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ, আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশ- বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার সরকারি অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তা হলে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তা হলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেসময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো, তেমনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ান এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ান বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটেলিয়ানই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটেলিয়ানের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানি ছিল আমার কোম্পানি আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ ইনফ্যান্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভারলির (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দি হিসাবে আটক করে এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা, প্রশংসা পেয়েছিল তাদের প্রীতির। যুদ্ধ বিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছুসংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভাল লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচুমানের সৈনিক। আমরা তখন মতবিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটি হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই

প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাইয়ের মত দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানিরা ভাবতো বাঙালিরা ভাল সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালি জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সেসময় পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণির সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানিরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগেছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালি পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালি জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালি সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ। এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করল এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করল, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকর করল। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালি সৈনিকদের মনে। বিমান বাহিনীর বাঙালি জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোনো বাহিনীর মোকাবিলাই আমরা সক্ষম। জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মধ্যে রইল শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমিতে শুরু হল আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানিদের আমি সমর বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগাল আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলন

সামরিক একাডেমিতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানিদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানিদের দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনও তেমনিভাবেই বাঙালি ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালি ছেলেদের, ভাল ছেলেদের নেয়া হতো না ক্যাডেটরূপে, রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমিতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করল। একাডেমির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভাল বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশুনা করলাম ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না, এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক বুদ্ধিজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরও কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের উপর পাকিস্তান-সরকারের চাপিয়ে দেয়া সব বিধি-নিষেধ ঝেড়ে ফেলা হল, এক কণ্ঠে সোচ্চার হল তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবিতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের- বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত তাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না আমাদের মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিক-দর্শন। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হল জয়দেবপুরে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে আমি ছিলাম সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানি। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করল, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তা হলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করল। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি। এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলেছে তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকর করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে, তারা বাঙালি নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বার বার তাকে জিজ্ঞেস করি– এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়- ভবিষ্যৎ

রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে। তার মতিগতি যে বেশি সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি বুঝতে পারি। সে বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানি যাই। এসময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এক রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক অ্যাটাচি কর্নেল জুলফিকার সেসময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কারিগরি অ্যাটাচির সাথে কথা বলছিল। এই ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচির দৈনিক পত্রিকা ডনের একটা সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষণা- ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসারটি বলছিল, নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি। এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বলল, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা অন্যদলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে। এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হল চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ানের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এর কয়েকদিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসাররা মনে করতো, চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতঙ্কের ছবি। তাদের এই আতঙ্কের কারণও আমার অজানা ছিল না। শিগগিরই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালি অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ান। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটেলিয়ানকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দু'শ' জওয়ানের এক অগ্রগামী দল। অন্যেরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল তিনশত পুরনো ৩০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দু'টি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

২৩শে মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়ানের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরও জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়িগুলোতে জমা করছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যক তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম। তারপর এল মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারাদেশে শুরু হল ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হল। বিহারিরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে, এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হল।

এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়ানের এনওসিরা আমাকে জানাল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায়, নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়। এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকান পাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তা হলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্নস্থানে জমা হতে থাকল, আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে, কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা, আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হল। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

৭ই মার্চ, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্সে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন

১৩ মার্চ শুরু হল বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য

আমদানি করা হল। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করল। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হল। ১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পর ইপিআর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করল। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমিকে বলল– ফাতমি, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম। ২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সাথে ঘটল তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ, এতে নিহত হল বিপুলসংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর এলো সেই কালো রাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিল নৌবাহিনী ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানি) প্রহরী থাকবে তাও জানান হল। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়ানের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কি না তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শিকারীর মতো প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদ আমাদের থামতে হল। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, 'তাঁরা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে।' এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম– আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেফতার করো। ওলি আহমদকে বল ব্যাটেলিয়ান তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পোস্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হল না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভাল সে আমার আদেশ মানল। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম হাত তুলো। সে আমার কথা মানল। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এ মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারদের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানল এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এল। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এস। সে আমার কথা মানল। আমি তাকে ব্যাটেলিয়ানে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম, আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলাল।

ব্যাটেলিয়ানে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম- ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কমিশনের ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ান বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে তারা। এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হল।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়ানের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম। তারা সবাই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখবে ভালবাসায়। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না। কোনোদিন না। ■



আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়া জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সাক্ষাৎকার

ডা. জাহিদুর রহিম



"জিয়াউর রহমান যেন কেবল নিজের 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি'র ওপর ভরসা করেই বাংলাদেশকে তার সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি দেশের জন্য এমন লক্ষ্য স্থির করেন, যেগুলোকে অনেক বিশেষজ্ঞ প্রায় অসম্ভব মনে করেন; এরপর রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণের ওপর এমন চাপ প্রয়োগ করেন, যাতে দেশ অন্তত সেই লক্ষ্যগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে–অধিকাংশ মানুষ আগে যতোটা সম্ভব বলে ভাবতো, তার চেয়েও বেশি"–ওয়াশিংটন পোস্ট (২৮ মার্চ, ১৯৮১)।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান হবার আগে থেকেই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে পরিচিত। জীবনে ব্যতিক্রম আর বিশেষ হবার মতো অনেক কাজ করার তাঁর আছে, যেসব কাজ সময়, সততা আর দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া'কে আজও জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক রেখেছে। যেমন, সেনাবাহিনীর পেশাদার অফিসার হয়েও তিনি গণতন্ত্র দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিলেন, তেমনি পেশাদার রাজনীতিবিদ বা রাজনীতির বাইরে থেকে এসেও মিডিয়ার কাছে তিনি ছিলেন সপ্রতিভ এবং প্রিয়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়।

তিনি ক্ষমতায় আসার আগেই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে ছিলেন, 'নিয়মনিষ্ঠ', 'মৃদুভাষী' একজন মানুষ। ('The New York Times'-এর ভাষায়, 'Bangladesh's Soft-Spoken but Strict President'। আমাদের দেশের লোকেরা 'Strict' বলতে 'কড়া' বা 'কঠোর' বোঝে সম্ভবত। প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার 'শেষ সাক্ষাৎকার' এর সময় নিয়ে দ্বিমত আছে, কিন্তু 'জীবিতকালে' বা 'জীবদ্দশায়' শেষ প্রকাশিত ইন্টার্ভিউ বা সাক্ষাৎকার নিয়ে বিতর্ক নেই। ব্যাপারটা খুলে বলা যাক।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার 'শাহাদাতে'র আগে ২৮ মার্চ ১৯৮১ সালে 'The Washington Post'র প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং দীর্ঘসময়ের আন্তর্জাতিক প্রতিবেদক স্টুয়ার্ট অয়ারবাখ (Stuart Auerbach) 'President Zia Has Reputation as Bangladesh's No. 1 Motivator', এর মূল্যায়নভিত্তিক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, যেটি খুব স্পষ্ট করে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দেশ পরিচালনা থেকে ব্যক্তিগত ইমেজের পরিষ্কার একটা ধারণা দেয়।

'The New York Times'-এর আন্তর্জাতিক প্রতিবেদক ও সম্পাদক Les Ledbetter-এর 'Ziaur Rahman was strict leader, who tried to give the Nation direction.'–এই শিরোনামে একটা আর্টিকেল ছাপা হয় (Published on May 31, 1981)। এ ছাড়া বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন 'The Times'-এ জুন ১, ১৯৮১ তারিখে Trevor Fishlock, (whwb Telegraph Ges The Times-এর লেখক এবং বিদেশ প্রতিনিধি ছিলেন) 'Bangladesh and the hazards of democracy'। ধারণা করা হয়, এই দুটি ইন্টারভিউ ১৯৮১ সালের এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের শুরুর দিকের। কিন্তু এ দুটোই প্রকাশিত হয়েছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ইন্তেকালের পরে।

সূচনা ও ইতিহাসের পটভূমি

মাসে অন্তত ২০ দিন তিনি হেলিকপ্টারে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল সফর করেন। সেখানে তিনি জনগণকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে এবং সেচের খাল খননে আরও বেশি শ্রম ও উদ্যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। কাজ শেষ করতে ব্যর্থ অলস ও নিষ্ক্রিয় আমলাদেরও তিনি প্রকাশ্যে তিরস্কার করেন। ওবায়দুল্লাহ খান বলেন, 'তিনি আমাদের প্রায় পাগল করে দেন।'–দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট (২৮ মার্চ, ১৯৮১)। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কোনো রাজনীতিবিদ বা রাষ্ট্রনেতার সাক্ষাৎকার ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুধু সাধারণ কথাবার্তা নয়। এটি এমন এক পরিকল্পিত ও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বিশ্বমঞ্চে ওই নেতার ভাবমূর্তি।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে একজন রাষ্ট্রনেতা কোনো নির্দিষ্ট বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক প্রসঙ্গে নিজের ও দেশের অবস্থান সরাসরি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে পারেন। আবার একইসঙ্গে প্রায়ই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো দেশ বা নেতার বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার বা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হলে এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সরাসরি 'জবাব দেওয়া' ও 'সত্য তুলে ধরা' সম্ভব হয়। একটি সফল সাক্ষাৎকার বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষ ও অন্য দেশের 'নীতিনির্ধার'কদের মনে ওই নেতা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করে।

'খ্যাতনামা' আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী মহলকে আকৃষ্ট করা যায়। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোনো নেতা দক্ষভাবে দেশের প্রতিনিধিত্ব করলে, দেশবাসীর কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। তিনি জনগণের চোখে এক 'রাষ্ট্রনায়ক' ও

'বিশ্বমানের নেতা' হয়ে ওঠেন। (রাজনীতিবিদ ও জননেতার মধ্যে যেমন পার্থক্য, সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে তেমনি বস্তু ও দর্শনগত পার্থক্য)।

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যখন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা আর ভূ-রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেসময়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামল (১৯৭৫-১৯৮১) রাষ্ট্র গঠনের ধারায় 'এক মোড় ঘোরানো' পর্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

'The Washington Post'-এ স্টুয়ার্ট অয়ারবাখ (Stuart Auerbach)-এর 'President Zia Has Reputation as Bangladesh's No. 1 Motivator' নামক মূল্যায়নধর্মী প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকারে গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে কীভাবে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, প্রশাসন কীভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল, 'স্বনির্ভর' কর্মসূচি কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল, খাদ্য নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তৃতীয় বিশ্বের জন্য একটি স্বাধীন ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থান কী কৌশলে তৈরি করা হয়েছিল।

প্রাথমিক আর্কাইভাল নথি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন এবং সমসাময়িক কূটনৈতিক দলিলপত্রের আলোকে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রমাণ করে, জিয়ার নেতৃত্ব শুধু 'সামরিক' বা 'প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে'র গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল 'আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা' ও 'জনগণের সম্পৃক্ততা'র এক 'সুসংগঠিত মেলবন্ধন'।

তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের ইতিহাসের সেই পর্ব সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা রাখতেই হবে। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল ভীষণভাবে টালমাটাল। বিশেষত ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের তীব্র সংকট এবং প্রশাসনের শিথিলতার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনা এক জটিল চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে 'পরোক্ষ'ভাবে, রাষ্ট্রক্ষমতায় সরাসরি আসীন না হয়েও জিয়াউর রহমান প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও গ্রামীণ অর্থনীতির সংস্কারকে প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে বেছে নেন। জিয়ার নেতৃত্বের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনিক দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সরাসরি জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার কৌশল।

মূল সাক্ষাৎকারের তর্জমা

'বাংলাদেশের এক নম্বর প্রেরণাদাতা' হিসাবে রাষ্ট্রপতি জিয়ার খ্যাতি (স্টুয়ার্ট অয়ারবাখ, The Washington Post, ২৮ মার্চ ১৯৮১)

"আজ থেকে এক দশক আগে, জিয়াউর রহমান নামের এক অপরিচিত সেনা মেজর, 'দখলকৃত' একটি বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। আর এখন সেই জিয়াই–(যিনি এরই মধ্যে সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত বা অবসর নেওয়া জেনারেল), বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণকারী সংবাদ দাতারা জিয়াউর রহমানকে 'বাংলাদেশের এক নম্বর প্রেরণাদাতা' বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর কৃষি সচিব এ. জেড. এম. ওবায়দুল্লাহ খান রসিকতা করে রাষ্ট্রপতিকে 'কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা' বলে অভিহিত করেছেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী, দুই সন্তানের পিতা জিয়াউর রহমান অত্যন্ত কর্মচঞ্চলভাবে সক্রিয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছেন। মাসে অন্তত ২০ দিন তিনি হেলিকপ্টারে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল সফর করেন। সেখানে তিনি জনগণকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে এবং সেচের খাল খননে আরও বেশি শ্রম ও উদ্যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। কাজ শেষ করতে ব্যর্থ অলস ও নিষ্ক্রিয় আমলাদেরও তিনি প্রকাশ্যে তিরস্কার করেন।

জিয়াউর রহমান যেন কেবল নিজের 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি'র ওপর ভরসা করেই বাংলাদেশকে তার সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি দেশের জন্য এমন লক্ষ্য স্থির করেন, যেগুলোকে অনেক বিশেষজ্ঞ প্রায় অসম্ভব মনে করেন; এরপর রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণের ওপর এমন চাপ প্রয়োগ করেন, যাতে দেশ অন্তত সেই লক্ষ্যগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে অধিকাংশ মানুষ আগে যতটা সম্ভব বলে ভাবত, তার চেয়েও বেশি।

এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উপেক্ষা করে জিয়াউর রহমান 'খাদ্যশস্য আমদানি'র ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, খরার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে দেশে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ করেছিলেন বাংলাদেশ আদৌ ওই খাদ্যশস্য কেনার সামর্থ্য রাখে কি না; এমনকি জাহাজে আসা খাদ্যশস্য দ্রুত খালাস করে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব হবে কি না, সে বিষয়েও তাঁরা সংশয়ে ছিলেন।

তবে জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত তাগিদ ও সরাসরি উদ্যোগের কারণে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ওই খাদ্যশস্য জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করতে সক্ষম হয়। ফলে ব্যাপক অনাহারের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। জিয়াউর রহমান বলেন, 'আমরা অপেক্ষা করে থাকতে পারতাম না, এই দেশগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রেই খাদ্য একটি রাজনৈতিক সমস্যা'।

গ্রামাঞ্চল সফরের সময় সাধারণত বুশ জ্যাকেট পরা, তুলনামূলকভাবে ক্ষীণদেহী জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। অন্যদিকে, আনুষ্ঠানিক পরিবেশে রক্ষণশীল কাটের স্যুট ও পরিপাটি ডোরা-কাটা শার্ট পরা জিয়াকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সেখানে তাঁকে প্রায়ই তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদনশীলতার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

জিয়াউর রহমান ঢাকার সামরিক এলাকার একটি ছোট বাড়িতে নিভৃতে বসবাস করেন; সেনাবাহিনীতে জেনারেল থাকার সময়ও তিনি এই বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর সহযোগীদের মতে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী; সকাল সাড়ে ৭টায় কাজ শুরু করে অনেক সময় পরদিন ভোররাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত কাজ করেন। তাঁর খাদ্যাভ্যাসও সাধারণত অত্যন্ত সংযমী ও মিতব্যয়ী। রাতের খাবারে তিনি একটি চাপাটি বা ভাজা রুটি ও অল্প তরকারি খান; দুপুরে সাধারণত স্যান্ডউইচই খান।

বিশ্বজনমত নিয়েও তিনি সচেতন। যে দেশটি টিকে থাকার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল গত বছর যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার তার জন্য আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও বিশ্বজনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সফরে আসা বিদেশি সংবাদদাতাদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি সাধারণত সহজেই নাগালযোগ্য (আভাইলেবেল) ছিলেন।

জিয়াউর রহমানের তৎকালীন বিশেষ আগ্রহের একটি প্রকল্প ছিল খাল খনন। তিনি এটিকে 'বাংলাদেশের খাদ্যসংকট' মোকাবিলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করতেন। গ্রামবাসীরা খাল খনন করতেন, আর পরে সেই খাল সেচের কাজে ব্যবহার করা হতো। এর ফলে একই জমিতে বছরে দুই, এমনকি তিনটি ফসলও উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে। অন্য এক সাক্ষাৎকারে জিয়া তাঁর উন্নয়ন-ভাবনার একটি মৌলিক নীতি সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেছিলেন, 'মানুষকে আত্মমর্যাদা, সংগঠন ও দায়িত্ববোধ দিতে হবে।'

সাক্ষাৎকারের বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ

'মানুষকে আত্মমর্যাদা, সংগঠন ও দায়িত্ববোধ দিতে হবে'–দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট (২৮ মার্চ, ১৯৮১)। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তার কার্যক্রম পর্যন্ত, তিনি দেশের উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার নেতৃত্ব শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল না, বরং জনগণকে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেছিল। প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক প্রথা ভেঙে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি যাতায়াতের নীতি গ্রহণ করেন। হেলিকপ্টারে চড়ে প্রত্যন্ত গ্রামে ভ্রমণ এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তিনি উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে গতি আনেন।

এই কৌশল মূলত দুটি প্রধান লক্ষ্য পূরণ করেছিল, প্রথমত, আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, যার লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ও সজাগ রাখা। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সংহতি, যা লক্ষ ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে জাতীয় মূলধারার উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করা। জিয়া মনে করতেন, শুধু ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নীতি দিয়ে রাষ্ট্রের স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, সমাজ পুনর্গঠনে সাধারণ মানুষকে 'সংগঠন, দায়িত্ববোধ এবং নিজস্ব সক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাস' দেওয়া জরুরি।

১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উদ্বেগকে পাশ কাটিয়ে জিয়াউর রহমান যে সাহসী পদক্ষেপে দেশের ভেতরেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির গতিপথে এক যুগান্তকারী মোড় এনে দেয়। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এই উদ্যোগকে ঝুঁকিপূর্ণ ভাবলেও কঠোর প্রশাসনিক নজরদারি ও দক্ষ বিতরণ ব্যবস্থার কল্যাণে এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

বিশেষভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খনন করা সেচ খাল কর্মসূচিই ছিল সেসময়ের কৃষি পুনর্গঠনের মূল হাতিয়ার। এই খালগুলোর সাহায্যে শুষ্ক মৌসুমেও জমিতে সেচ পৌঁছে যায়, ফলে বছরে একবার ফসল

উৎপাদনকারী জমিগুলো দুই ও তিনবার ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয়ে ওঠে। এতে কেবল খাদ্য উৎপাদনই বাড়েনি, বরং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় স্বনির্ভরতা অর্জিত হয়। জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত জীবনযাপন ও কাজের প্রচেষ্টা তাঁর প্রশাসনিক কাঠামোর উপর সরাসরি ছাপ ফেলেছিল। তার সহকর্মীদের বর্ণনা এবং কূটনৈতিক পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং পরিশ্রমী জীবনের অধিকারী। তিনি প্রতিদিন গড়ে সকাল ৭:৩০ থেকে পরদিন রাত ১:৩০ পর্যন্ত কাজ করতেন। তার খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় ফুটে ওঠা চরম সংযম (যেমন সাধারণ স্যান্ডউইচ কিংবা রুটি-সবজিনির্ভর আহার) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে এক নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, যা দুর্নীতি কমাতে এবং কর্মদক্ষতা বাড়াতে সহায়ক হয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে নিষ্ক্রিয় ও সহায়তানির্ভর দেশের গণ্ডি থেকে বের করে এনে একটি স্বাধীন, সংহত ও উৎপাদনশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা দেন। পশ্চিমা অর্থনৈতিক সহায়তা গ্রহণ করলেও তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM), ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (OIC) এবং জাতিসংঘে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক অধিকারের পক্ষে জোরালো কণ্ঠস্বর ছিলেন। বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য তার দরজা ছিল সবসময় খোলা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা গড়ে তোলা এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC)-এর প্রাথমিক রূপরেখা রচনায় তাঁর ভূ-রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বিশ্বদরবারে স্বীকৃতি পায়।

এই সাক্ষাৎকারটি কেবল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব, প্রশাসনিক উদ্ভাবন, জনসংযোগ ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবই তুলে ধরে না, বরং সময়ের এক ধারাবিবরণীও। শহীদ জিয়ার উদ্ভাবনী উদ্যোগ, বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, সেচ খাল খনন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি যোগাযোগ, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অনুকরণীয় প্রভাব রেখেছে। তাই 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে' প্রকাশিত প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই সাক্ষাৎকার তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং নেতৃত্বের নীতি–যা তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভাবনী ও প্রেরণামূলক নেতৃত্বের একটি মডেল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, তেমনি জনমুখী রাষ্ট্রনায়ক ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রেরণাদায়ী প্রতিচ্ছবি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের 'ইতিহাসের অ্যালবামে' থেকে যাবে ঐতিহাসিক সাক্ষী হিসাবে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখক : জনস্বাস্থ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষক এবং সদস্য, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের



তম

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

এ্যালবাম

বিশেষ ক্রোড়পত্র
বৃহস্পতিবার ২০ নভেম্বর ২০২৫, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

আর্তমানবতার সেবায় তারেক রহমান



কৃষকের মাঝে গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জনাব তারেক রহমান

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এবং বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের আজ ৬১তম শুভ জন্মদিন। ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক অভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জনাব তারেক রহমান এমন একজন পরিপূর্ণ রাজনীতিবিদ। রাজনীতিই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন। সুদূর লন্ডনে বসেই তিনি দলের স্থায়ী কমিটি থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন দিন-রাত। দেশের সর্বমূহুর্তে এমন একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে দিনের পুরো সময় চলে যায় দিক-নির্দেশনা দিতে দিতে। সেখানে রাজনীতির বাইরে সময় বের করা খুবই কঠিন। কিন্তু তারপরও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের জীব-নমান বদলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁরই হাতে গড়া সেবামূলক প্রতিষ্ঠান জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে 'আর্তমানবতার সেবায়' কাজ করে চলেছেন নিরন্তর। যদিও তিনি রাজনীতি করতে এসে অন্য যে কারো চেয়ে বেশি নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এমনকি তাঁর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই চরম দুর্যোগের মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়েছেন। একমাত্র ভাইকে হারিয়েছেন বিনা চিকিৎসায়; মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন গর্ভধারিনী মা। তারপরও তিনি তাঁর দেশ সেবার ব্রত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেননি একটুকুও।

বিগত ষোলো বছর ফ্যাসিবাদী শাসনের কবলে পড়ে নির্যাতনের শিকার কেউ পা হারিয়েছেন, কেউ হাত হারিয়েছেন, কেউ হারিয়েছেন চোখ, আর এমন হাজারো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাঁর নির্দেশে ফাউন্ডেশনের একদল চিকিৎসক এইসকল অসহায় মানুষদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। বিশ্বত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় যারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, গোপনে গোপনে সেসময় তাদের বিদ্ধে গ্রাইন্ডেট হাস-পাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয় তাঁরই নির্দেশে। ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের পর বিদ্ধে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ ছোত্রাদের শরীর থেকে গুলি বের করা, চোখ হারানো ছোত্রাদের সঠিক চিকিৎসা দেওয়া এবং হাত-পা হারানো ছোত্রাদের অঙ্গ সংযোজন করা সবই হয়েছে তাঁর নির্দেশে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য ফাউন্ডেশনের সদস্যদের মাধ্যমে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি যখন দেশে ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেই ১৯৯৯ সালে- তখন তাঁর মাত্র তত্ত্ব হয় "একটি উদ্যোগ একটু চেষ্টা, এসে দেশে স্বচ্ছলতা, দেশে আসবে স্বনির্ভরতা" শীর্ষক শ্লোগান নিয়ে। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর নির্দেশনায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আর্তমানবতার সেবায় কাজ বাড়িয়ে চলে ক্রমাগত। তারেক রহমানের মানবিক কর্মকাণ্ডগুলোর বেশিরভাগই বাস্তবায়িত হয়েছে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন এর হাত ধরে। এবং এই ধারাবাহিকতা চলমান রয়েছে। আজ তাঁর ৬১তম জন্মদিনে এইসব কর্মকাণ্ডের কিছুটা তুলে ধরতে চাই।

অসচ্ছল মেধাবীদের পাশে

তারেক রহমানের নির্দেশে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৪ সালে চালু হয় বৃত্তি প্রদান প্রকল্প। আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ধরে রাখতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়। ২০০৫ সালে ঢাকার এলাহিয়ি কলেজ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই বৃত্তি প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১/১১ সময়ের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে কিছুদিন কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও সরকারীতে এটি আবার বিস্তৃত পরিসরে চালু হয়।

ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমানের নির্দেশনিদর্শনায় পুনরায় ২০২৪ সালে সারাদেশের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিএনপি নেতাকর্মীদের ১৯ জন সন্তানকে শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অসহায় মানুষের স্বাস্থ্য সেবায়

দেশে যেকোনো দুর্যোগ, সংকট বা জরুরি অবস্থায় জেডআরএফ সিমাহিতভাবে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে থাকে। এসব ক্যাম্পে রোগীদের চি-কিৎসা, ওষুধপত্রসহ বিশেষ প্রয়োজনে ঢাকায় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়া হয়। খুলনার ঝুপসা, চাকার রাজবাড়ি, কক্সবাজার বন্যি, সাভারিপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং সম্প্রতি বন্যাকবলিত নাগরকদিয়ে এসব মেডেই এ সহযোগিতা চলছে এবং বহু মানুষ এই মানবিক সেবা থেকে উপকৃত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিশুদ্ধ কমল পানি সরবরাহ

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিশুদ্ধ পানির সমস্যায় নীরবদিনের। সেখানে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্রটির কারণে পানিদূষণ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারেক রহমানের নির্দেশে এই সমস্যা সমাধানে জেডআরএফ পরিচ্ছন্ন পানি উন্নয়ন একেএসবি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সমস্ত পানি প্রকল্প চালু করে। এছাড়া ১২০টি পরিবার এ প্রকল্পের আওতায় বিশুদ্ধ পানির সুবিধা পাচ্ছে। পাশাপাশি একাধিক অঞ্চলে ১৬০টি পরিবারে স্বচ্ছ জল প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্যোগে কুমীরা জলসংকটের জীব-নমান উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রেখে চলেছে।

কৃষকের কল্যাণে কমল বীজ

বাঁধালদেশের কৃষকরা দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হলেও মাত্র ৭ শতাংশ কৃষক উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করেছেন একটি বড় ঘাটতি। জনাব তারেক রহমানের নির্দেশে এই সমস্যা নিরসনে জেডআর-তাঁরই কমল বীজ প্রকল্প পুনরায় চালু করে। এ প্রকল্পে কৃষকদের উন্নতমানের বীজ সরবরাহের পাশাপাশি তাদের বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষির আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

করোনাকালে তারেক রহমানের নির্দেশে জেডআরএফ কর্মকাণ্ড

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির সময়ে জেডআরএফ ব্যাপক মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানের নির্দেশনা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা: জুবাইদা রহমানের পরামর্শে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান বন্দরের বাগবাড়িতে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প করা হয় চলতি বছর ১৮ অক্টোবর। ফাউন্ডেশনের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় দাত হাজার রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসক এবং অন্যান্য সদস্যরা সুবিধাপ এই স্বাস্থ্য শিবিরের কাজ অত্যন্ত সমন্বয়ভাবে সম্পন্ন করেন। শীতের কারণে চাহতাক-মিত্র ভোগে আক্রান্ত মানুষকে চিকিৎসা সেবাদান জন্য তাদের কাছটিল একটিকে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। সিলেটে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করে সেবা প্রদান করা হয় কয়েক হাজার রোগীকে।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে কাটাকাটা রোগী

জনসেবা তারেক রহমানের আজকে একটি বিশেষ উদ্যোগে চিকিৎসে জেডআরএফ জার্মান সিলেশজন সার্জনদের সহযোগিতায় বন্যায়, খুলনা এবং পার্বত্যজায় প্লাস্টিক ও রিকন্সট্রাকটিভ সার্জারি ক্যাম্প আয়োজন করে। এই ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৪৫০ জন ঠোঁটকাটা, তালুকাটা ও শেপ্লা রোগীকে বিশেষজ্ঞ অস্ত্রোপচার করা হয়। আর্থিক অক্ষম বা চিকিৎসা সুবিধার অভাবে সাজারি করতে না পারলেও এসব ক্যাম্পের মাধ্যমে অনেকেই নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। এক্ষণত বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স রোগীদের সেবায়

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ অ্যাম্বুলেন্স ভোগে আক্রান্ত (২০০৩ সালের হিসাব)। সরকারি ক্ষেত্রে একটি মাত্র সমন্বিত অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থা এবং রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত সেবা পাওয়া কঠিন। এই প্রয়োজনের অনুভব করে মানবিক তারেক রহমান-এর দিক নির্দেশনায় জেডআরএফ ২০০৩ সালে যাত্রা এবং ২০০৪ সালে চট্টগ্রামে অ্যাম্বুলেন্স সেবার এর ডিজেলস সেবার প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত যাত্রায় প্রায় ৫,৮৭৩ জন এবং চট্টগ্রামে ৩,৭১৯ জন রোগী সুলভ মূল্যে ডিজেলসেবা পেয়েছেন। কার্যত্রয়ের এই সেবা চলমান রয়েছে।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন

মন্ত্রণালয় সেক্টর তারেক রহমান-এর দিকনির্দেশনা ও নিবীড় পরিচালক ডা: সবরাহ হাসিব চৌধুরী-এর তত্ত্বাবধানে পাবত্রাজিক অপেশায় ও দুর্গটনার কারণে যারা হাত-পা হারিয়েছেন, তাদের জন্য জেডআরএফ কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৫০ জনেরও বেশি মানুষকে কৃত্রিম হাত ও পা সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ ফ্রি চিকিৎসায় কৃত্রিম হাত ও পা পেয়েছেন। এই কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪ সালে ৩৫ জন এবং ২০২৫ সালে ৪৫ জন মানুষকে কৃত্রিম হাত ও পা সংযোজন করা হয়েছে।

৩. জরুরি হটলাইন স্বাস্থ্যসেবা চালু :

বাংলাদেশ যখন এক ভয়াল দুর্যোগে আক্রান্ত, মানুষ যখন জীবন বাঁচানোর জন্য ঘরিয়া টিক তখনই তারেক রহমানের নির্দেশে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডাইরন এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ডাব সৌথভাবে এগিয়ে আসেন। এরকম অভূতপূর্ব চি-কিৎসক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদলকে সাথে নিয়ে করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে যেকোনো পরামর্শ এবং প্রাথমিক জরুরি স্বাস্থ্যসেবার জন্য ২৪ ঘন্টার মোবাইল হটলাইন সেবা চালু করা হয়। রোগের ধরন বুঝে সংক্রিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে ফোনে সরাসরি কথা বলার পাশাপাশি সমস্যা জোনে টেলিমেডেকেই রোগীকে প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়। মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে রোগীর চাহিদা অনুযায়ী ঔষধসহের বন্ধুর রোগীর বাড়ি পৌঁছে দেয়া হয়। এর জন্য একটি টিম নিরন্তরভাবে পৌঁছে দিয়ে সেবাদানে নিয়োজিত ছিল। এছাড়া অফি গাইড, বাসের বন্ধুর কেন্দ্রের সমন্বয়ে তাঁকে তাদের জন্য ফ্রি ওষুধের ব্যবস্থাও করেছে ফাউন্ডেশন।

৪. প্রাইভেট মেডিকেল সিপিই প্রদান :

উদের ইরান প্রায়েশে করোনা সেবার প্রয়োজন প্রকোন দেখা সেয়ার পর যখনই সময় হাতে পাওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারদের পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সরবরাহের বিষয়ে সরকারি হাস-পাতালগুলো যেমন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি বেসরকারি হাসপাতালগুলোও ব্যর্থতার খান্তর প্রোবেক্ষিল। সেখানে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডাইরন এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে দেশের প্রায় শতাধিক প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরতদের জন্য কয়েক হাজার পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) প্রদান করা হয়।

৫. স্বাস্থ্যসেবা ফেলত্রু :

বিএনপি'র ভাইরপ্রধান ডা. জাহিদ ফোরহাসান-এর নির্দেশনায় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-এর নির্দেশনায় বিশ্বমমমর্যাদার এই দুলসয়ের জেডআরএফ জনগণের মাঝে নিবেদিত্রে ও সিটিজেনকে কাজ করেছে। ধারাবাহিকতাকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিভিন্ন রোগ যেমন- ডিয়াবি সমস্যা, মস্তিষ্ক ও স্নেপসজ্জা সমস্যা, প্রসূতি মায়ের সার্জিক সমস্যা, কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা, শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা এবং আগ্রহীবন্ধারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এসএটি ছিল স্বাস্থ্যসেবা ফেলত্রুক প্রশ্নের দাইরে থেকে।

৬. হাজ্জ যাত্রা ফেলিক প্রকল্প :

জরুরি হটলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি হাজ্জ যাত্রা সেবা নিয়েও সাধারণ জনগণের পাশে ছিল জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন। বিদেশের কাছে সাহায্যকারী অত্র দেশের মানুষের জন্য বীমাদীন জনগণের দিয়ে অত্যন্ত শ্রম দিয়ে যেসব জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সদস্যিক সকল সদস্য। তারেক রহমানের নির্দেশে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজনীতি বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার অত্যন্ত করণীয় সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ও সেনিস সময়তা হয়েছিল সেই সময়ে।

৭. ছোত্র জীবাণুমুক্তকরণ সেবা :

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের আক্রমের সাথে ছোত্র এবং এর এর জন্যাবহতা নিয়ে কিছু ভলতে। এরকমস্থায়, মানুষ যখন করোনা ও ছোত্র সৃষ্ট সমস্যা থেকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সে জন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন জরুরি হটলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও হাত ধোয়া সেবার পাশাপাশি ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিনা মূল্যে জীবাণুমুক্তকরণ সেবা দিয়ে রাজনগরীর বিভিন্ন জায়গায় করোনা আক্রান্ত ও ছোত্র রাকিয়েকে জীবাণুনাশক স্প্রে কার্যক্রম চালু করেছিল এবং এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে।

৮. 'স্বাস্থ্যসাথী এপস' :

বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি মোকাবেলা করে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সদস্যিক সকল সদস্য করোনা মোকাবেলায় অগ্রণক ভূমি-কাদিয়েছেন। ফলে, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন সিক্ত সদস্যদের সিরসপরের বিশ্বটি জানাদের নিয়েছে সবার আগে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কর্মরত জেডআরএফ-এর সদস্যিক সকল সদস্যের জন্য জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই), মাস্ক, হ্যান্ড ড্রাবল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেছে সেই সময়ে। উল্লেখ্য, ঢাকা জেলার জন্য ফ্রিয়ার সর্জিন্যুয়োগ জেসিআরই এবং অন্যান্য জেলার ফুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী সকল সরঞ্জামাদি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। করোনা দুর্যোগের এই সময়ে ৭ জেলায় একত্রে বন্যা দেখা দিলে সেখানে বন্যা বিত্তরণ করা হয় এবং বন্যার পর কৃ-ষকদের মাঝে কমল বীজ বিতরণ করা হয়।

৯. টেলিমেডিসিন সেবা :

করোনা অতিমারীর সময়ে যখন মানুষ জীবনত্রস্ত, সবল বয়সের রোগীদের জন্য হাসপাতাল খাওয়া যেখানে খুঁকিপূর্ণ তখন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক চালিত ২৪ ঘন্টার টেলিমেডিসিন, বিভিন্ন ভাষ্টয়ান প্রাটফর্ম-যেমন মেসেঞ্জার, ভাইবি, ফেসবুক ইত্যাদি ব্যবহার করে মধ্যমতে সেবা দিয়েছিল বন্ধদশের সবচেয়ে ছুটে চলা মানবতার এক ফরতরী জেডআরএফ।

১০. ফ্রেন্ড হেলপ লাইন :

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও তাদের পক্ষ থেকে ২৪ ঘন্টার ফ্রেন্ড হেলপ লাইন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল করোনা-কালীন সময়ে। যদি কোনো রোগীর এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের প্রয়োজন হয় তবে সার্ভিস পরিচালনা টিমকে টেলিফোনের মাধ্যমে অবগত করে রোগীর বাসার এ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যেত। জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহের সকতায় হলে উক্ত টিমের স্বাস্থ্যকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বাসায় তা পৌঁছে দিত। প্রয়োজনমতো স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর উক্ত রোগের, হার্ট রেট, পালস রেট, ভূমের পরিমাণ এবং ব্লাড সুগার লেভেল নিয়মিত করে নিয়েছিলেন সেই সময়ে।

১১. শিক্ষক ব্যবস্থাকরণ মেলার তারেক রহমান :

করণদের মেধা ও মানসিক বিকাশের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন তারেক রহমান। করোনার সময় যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তালাবন্ধ ছিল তখন আয়োজন করা হয় ছাড়িয়া বিজ্ঞান মেলা :

জেডআরএফ এর আইসলেটিউট অব তারেক রহমান-এর নির্দেশনায় বিশ্বমমমর্যাদার এই দুলসয়ের জেডআরএফ জনগণের মাঝে নিবেদিত্রে ও সিটিজেনকে কাজ করেছে। ধারাবাহিকতাকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিভিন্ন রোগ যেমন- ডিয়াবি সমস্যা, মস্তিষ্ক ও স্নেপসজ্জা সমস্যা, প্রসূতি মায়ের সার্জিক সমস্যা, কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা, শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা এবং আগ্রহীবন্ধারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এসএটি ছিল স্বাস্থ্যসেবা ফেলত্রুক প্রশ্নের দাইরে থেকে।

১২. অক্সিজেন সরবরাহ :

করোনা মহামারীকালে অসহায় জনগণের মাঝে বিনামূল্যে জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ ছিল ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কাজ। করোনা আক্রান্ত কোন রোগীর স্বচ্ছন অক্সিজেনের জন্য ফাউন্ডেশন নির্ধারিত টিকিলসকের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসেনকে অক্সিজেন সরবরাহ করা হতো।

দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তারেক রহমানের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা

তারেক রহমানের নির্দেশে দাপ্তরিক সময়ে জেডআরএফ বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যেমন ফেনীর বন্যায় ফাজিয়ারদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা, খুলনী আগুনলাগের সময় আহতদের চিকিৎসাসেবা, মাইনসৌল ট্র্যাজেডিতে লঙ্ঘ ও শিক্ষকদের সহায়তা, দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ, ছোত্র ও আওয়ামী লিগিদের সেবাকরণ সৃষ্টি, ছাদরোধ প্রতিরোধক প্রাচরণ, মন্ত্রণা ও এভিথখনায় ঈদ উদ্বয়ায় ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। এসবের মধ্যে কিছু সাম্প্রতিক কার্যক্রম নিয়ে তুলে ধরা হলো।

ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প

তারেক রহমান-এর দিক নির্দেশনায় এবং নিবীড় পরিচালক ডা: ফরহাদ হাসিব চৌধুরের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী ফ্রী ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে আসছে ফাউন্ডেশন। এরই ধারাবাহিকতায়, ৩০ আগস্ট ২০২৫ জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মধ্যমনস্থিত জেলার সুফিয়াখালি গ্রামের অধিষ্টিতিদিন উক্ত দিনব্যাপী ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় কুলীয় কৃষকদের মাঝে ঔষধ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। চট্টগ্রাম বাঁশখালীতে "জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন" এর উদ্যোগে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও ঔষধ গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় ১৫ নভেম্বর ২০২৫।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি

ধরনের মধ্যে অবর্জনা এবং পরিবেশ থেকে বাশর কারণে আমাদের স্বাস্থ্যহানি হয়বুঝিয়ারী পরিষ্কারণে উপজিত করে জেডআরএফ তারেক রহমানের ভাই ডা: জুবাইদা রহমানের উদ্যোগে এবং নিবীড় পরিচালক ডা: ফরহাদ হাসিব চৌধুরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা তাদের সুবিধাদের আর বেশ কয়েক দফায় পরিষ্কার অভিযান করে বিস্তারিত্ব একক। তারা এগুলো যখন আবুধান মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিল তখন তাদের চোখে মুখে যে সুবিধীনতার অনন্দ আমরা দেখেছিলাম তা ভিন্নদিন মনে থাকবে। উপাজ্ঞক আয়োজন করেনকারদের মানুষের নিরাপত্তা, সচেতনতা ও স্বাস্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উপসংহার

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৬ বছরের যাত্রা মূলত মানবকল্যাণ, সমমর্মিতা, উন্নয়ন ও সেবার ইতিহাস। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, দুর্যি, সামাজিক সিত্যাগ্রহ, দুর্যোগ-পরিস্থিতি এবং মানবিকতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কার্যক্রম রয়েছে বহুমুখী উদ্যোগের প্রয়োজনে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। মানবতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এই সংগঠন ভবিষ্যতেও দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাবেন এমনটাই প্রত্যাশা। আমরা বহু পরিসরে চলতে থাকবে আর্তমানবতার সেবা। মানবতাবাদী ধারে ধুলাদিন একজন তারেক রহমান যখন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তখন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের এর কর্মধারা বিস্তার লাভ করবে। প্রত্যয় অক্ষম সব সময়ে সকল জনসাধারণের জন্য কাছেই এই ফাউন্ডেশন তার কার্যক্রম বাড়িয়ে চলবে। বিভিন্ন পেশার প্রতিটি ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত একটি টেকসই টিমের মাধ্যমে তারেক রহমানের তীব্র আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে জনগণের এই সকল কর্মসূচি আরোতের মতো অবিরামভাবে চলবে। আজ এই শুভদিনে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন জিনি যেন আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান এর সুস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখেন। জেডআরএফ-এর সকল আমরা সকলে নিবীড় পরিচালক অধ্যাপক ডা: ফরহাদ হাসিব চৌধুরের জনাব তারেক রহমানের মানবকল্যাণী এই প্রতিষ্ঠানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তারেক রহমান এর মানবতার দর্শনকে সেপের প্রতিটি মানুষের জন্যে পৌঁছে দিতে আমরা দিয়েছিব বদ্ধপরি।





জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দানকালীনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে আগত রোগীদের চিকিৎসা চলছে (বীয়ে)। জনাব টেবলে বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান। পাশে আছেন ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বি কার্ডিলজিস্টী ডা. জুবাইদা রহমান - ফাইল ফাউন্ডেশন



কমল বীজের প্যাকেট কৃষকের হাতে হাসি। তাতে অংশ নিলেন ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান - ফাইল ফাউন্ডেশন



জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মহামনিসদের মুক্তিযোদ্ধাদি গ্রামের অধিষ্টিতিদিন উক্ত দিনব্যাপী ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পে গবাদি পশুকে টিকা দেওয়া হয় -ফাই ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে



কেশীতে বন্যাকবলিত মানুষ এলে বিতরণ করেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হাসিব চৌধুর - ফাই ফাউন্ডেশন

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন (জেডআরএফ)-এর প্রেসিডেন্ট ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে জেডআরএফ কর্তৃক ফলপাস-১, রোড-২৩/এ, বাড়ি-০২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত, ফোন: ০১৮১৭২২৬৬৪৪

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র



জেডআরএফ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন বেগম খালেদা জিয়া (ফাইল ছবি)



জেডআরএফ-এর প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানের নেতৃত্বে শহীদ জিয়ার মাজারে পুষ্প স্তবক অর্পন



একদল তরুণ চিকিৎসকদের নিয়ে জেডআরএফ-এর যাত্রা শুরু (ফাইল ছবি)



উন্নতমানের বীজ উৎপাদন পরিদর্শনে ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান



মানিকগঞ্জে উন্নত জাতের ধানের চারা বিতরণ



জেডআরএফ-এর ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা



চাষীদের জন্য জেডআরএফ-এর মৎসপোনা অবমুক্ত



জেডআরএফ আয়োজিত ইফতার পার্টি



জেডআরএফ আয়োজিত আলোচনা সভা



তারেক রহমান সম্পাদিত জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা উৎসব



লন্ডনে তারেক রহমান সম্পাদিত জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা উৎসব



কক্সবাজারে তৃণমূল সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জনাব তারেক রহমান



কৃষকদের মাঝে ছাগল বিতরণ করছেন তারেক রহমান



জেডআরএফ-এর আলোচনা সভায় তারেক রহমান



ফাউন্ডেশনের তিন নেতা তারেক রহমান, ডা. আমান ও ডা. ডোনার



জেডআরএফ-এর পক্ষ থেকে শহীদ পরিবারকে সহায়তা প্রদান (ফাইল ছবি)



জেডআরএফ-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী



ডেঙ্গু সচেতনতায় জেডআরএফ



জেডআরএফ-এর পক্ষ থেকে হাঁস মুরগী প্রদান



জেডআরএফ-এর পক্ষে মশার লার্ভা নিধনে স্প্রে



জেডআরএফ-এর পক্ষে মশার লার্ভা নিধনে স্প্রে



ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে ঔষধ বিতরণ



ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে ঔষধ বিতরণ



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর চূড়ান্ত পর্ব



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর চূড়ান্ত পর্ব



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর ২য় পর্ব



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর ১ম পর্ব



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর ১ম পর্ব



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর ১ম পর্বের অংশগ্রহণকারীদের সাথে আহ্বায়ক



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর ১ম পর্ব



জেডআরএফ আয়োজিত আইডিয়া ফেস্ট-এর ১ম পর্বের অংশগ্রহণকারীরা



জিডআরএফ-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা



জিডআরএফ-এর প্রতিষ্ঠা বর্ষিকীতে শহীদ জিয়ার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন



ফেনীতে বন্যার্তদের মাঝে জিডআরএফ



ফেনীতে বন্যার্তদের মাঝে জিডআরএফ



ফেনীতে বন্যার্তদের মাঝে জেডআরএফ



সিলেটে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে জেডআরএফ নেতৃবৃন্দ



মাইলস্টোন স্কুলের আহত শিক্ষার্থীর হাতে জেডআরএফ-এর উপহার



সিলেটে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা



জুরাইনে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে মশারি বিতরণ



ডেঙ্গু সচেতনায় লিফলেট বিতরণ



বসিলায় নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে মশারি বিতরণ



ভাষানটেকে ফ্রি হেল্থ ক্যাম্প



ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং সচেতনা বৃদ্ধি কর্যক্রম



ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের ফ্রি চিকিৎসা



ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসা চলছে



করোনাকালে ঔষধ ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ



ঢাবির কার্জন হলে জেডআরএফ-এর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন



জেডআরএফ পরিবেশিত কমল বীজ থেকে উন্নত ধান পরিদর্শন



বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে জেডআরএফ-এর প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক রহমান



কমল বীজ নিয়ে কৃষকের সাথে মতবিনিময়



সুলভ মূল্যে কমল বীজ বিতরণের জন্য প্রস্তুত



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে গবাদি পশুর টিকাদান কার্যক্রম



ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প



জেডআরএফ-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা



জেডআরএফ-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শিশু-কিশোরদের আনন্দ উল্লাস



অতিথিদের সঙ্গে শিল্পী ও শিশু-কিশোররা



মহান বিজয় দিবসে শহীদ জিয়ার মাজারে জেডআরএফ-এর শ্রদ্ধা



জেডআরএফ-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শহীদ জিয়ার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ



ভাষানটেকে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে জেডআরএফ-এর ঔষধ বিতরণ



বগুড়ায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প



ভাষানটেকে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প



ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাইস-প্রেসিডেন্টের বক্তব্য



ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণ



ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণ



ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান



ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান



জেডআরএফ আয়োজিত ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা



জেডআরএফ আয়োজিত ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলা



ভার্চুয়াল বিজ্ঞান মেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



কর্মজীবী মানুষের সম্মানে জেডআরএফ-এর ইফতার



করোনা মহামারিকালে জরুরী সেবায় জেডআরএফ-এর এম্বুলেন্স সেবা



করোনা মহামারিকালে কার্ডিওলজি বহিঃ বিভাগ পরিদর্শন



করোনা মহামারিকালে ঔষধ সামগ্রী বিতরণ



করোনা মহামারিকালে জরুরী সেবায় জেডআরএফ-এর জরুরী সেবা



করোনা মহামারিকালে ঔষধ সামগ্রী বিতরণ



করোনা মহামারিকালে জরুরী সেবায় জেডআরএফ-এর জরুরী সেবা



সেই নিষিদ্ধ সময়ে যাদের চিকিৎসা দেয় জেডআরএফ চিকিৎসকগণ



সেই নিষিদ্ধ সময়ে যাদের চিকিৎসা দেয় জেডআরএফ চিকিৎসকগণ



আহত জুলাই যোদ্ধাদের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



আহত জুলাই যোদ্ধাদের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



আহত জুলাই যোদ্ধাদের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



আহত জুলাই যোদ্ধাদের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



জুলাই শহীদ পরিবারের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



জুলাই শহীদ পরিবারের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



আহত জুলাই যোদ্ধাদের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



জুলাই শহীদ পরিবারের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



বগুড়ার বাগবাড়িতে মেডিক্যাল ক্যাম্পে বক্তব্য প্রদান



বগুড়ার বাগবাড়িতে মেডিক্যাল ক্যাম্পের কাজের ফাঁকে



বগুড়ার বাগবাড়িতে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান



ফ্রি চিকিৎসা প্রদান



জিয়াউর রহমানের জন্মভূমিতে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প



বগুড়ার মেডিক্যাল ক্যাম্প



বগুড়ার চক্ষু শিবিরে চলছে চিকিৎসা



বগুড়ার ফ্রি ডেন্টাল চেক-আপ



জেডআরএফ-এর নির্বাহী পরিচালককে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়



জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জেডআরএফ-এর নির্বাহী পরিচালককে সংবর্ধনা



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে নয়া পল্টনে শীত বস্ত্র বিতরণ



বিএনপির সাবেক মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গ্রেফতার হওয়ার পর তার বাসভবনে যান জেডআরএফ-এর নেতৃবৃন্দ



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বৃক্ষরোপণ



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ



জেডআরএফ-এর ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সফল করতে এসএসএফ-এর সঙ্গে উদযাপন কমিটির বৈঠক



শহীদ জিয়ার ৮৬তম জন্মবার্ষিকীতে জেডআরএফ-এর স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন



ঠান্ডাজনিত রোগের চিকিৎসা প্রদানের আগে ডাক্তারদের সঙ্গে মতবিনিময়



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ



জেডআরএফ-এর উদ্যোগে হাম সম্পর্কে সচেতন করতে লিফলেট বিতরণ



জুলাই শহীদ পরিবারের কাছে জেডআরএফ-এর ঈদ উপহার



ZIAUR RAHMAN FOUNDATION

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন